ধান-খেত

জসীম উদ্‌দীন

এম্পায়ার বুক হাউস
১৫, কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক—
মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা
এম্পায়ার বুক হাউস
১৫নং কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
পৌষ ১৩৩৯

এক টাকা

নিউ সরস্বতী প্রেস
প্রিণ্টার—শ্রীমিহির চন্দ্র ঘোষ,
২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

পরম শ্রদ্ধাস্পদ সার হাসান সুহ্‌রাওয়ার্দ্দি
খেদমতে

বাঙালী মুসলমান

সারা দেশ ভরি ঝিমাইছে এক জেন্দা গোরস্থান।
অতীত তাহার ধু'য়ে মু'ছে গেছে, পরি' কলঙ্কটিকা,
কুড়াইছে সুখে যুগের যুগের অভিসম্পাত শিখা।
চলে খানসামা আরদালী আয়া কুলী মজুরের দল
চলে গাড়োয়ান কোচ্‌মান চাষা করি মহা কোলাহল।
হুজুরে হুজুরে 'সেলাম' ঠুকিয়া কপালে প'ড়েছে দাগ
ভিখারীর মত খুঁটিয়া খাইছে দয়ার কণিকা ভাগ।

তাহাদের মাঝে কে দাঁড়ালে আসি, মেরু কুহেলির দেশে
প্রথম উদয় অচল শিখরে জবাকুসুমের বেশে।
'সরস্বতী' সে কবে চ'লে গেছে, শূন্য আসনে তার
যত অযোগ্য কলঙ্ক লেখা লিখে গেল যার যার।
তুমি সেইখানে বসিলে আসিয়া, মহা গৌরবে তব
হীন বঙ্গের নব নালন্দা হ'ল আজি অভিনব।
'সরস্বতী'র বড় আদরের ভাষার দুলালী মেয়ে
হাসিছে সে মৃত পিতারে তাহার তোমার মাঝারে পেয়ে।

শুনিয়াছি কোন সুদূর অতীতে শাহান শাহেরা কেবা
দিয়েছিল এই বঙ্গভাষারে প্রথম স্নেহের সেবা।
আপন হস্তে পরাল কণ্ঠে মণিমাণিকের হার—
মহারৌরব নরক হইতে করি তারে উদ্ধার।
সে সব আজিকে অতীত কাহিনী, মাটির ঢাকনী তলে
গোরস্থানের আঙিনায় তারা ঘুমাইছে কুতুহলে।
নিজেদের যত গ্লানি ছড়াইছি সেই কবরের পর
উপরে আমারা পশুর অধম তাদের বংশধর।

তাহাদের মাঝে কে আসিলে তুমি, গৌরবে বুক ভরে
সরস্বতীর মন্দিরে ঠাঁই পেল ভাষা তব বরে।
এক মুসলিম ধূলি হ'তে তারে ক'রেছিল আহরণ
আর মুসলিম দিল আজ তারে নব রূপ আভরণ।
অনাগত যুগে এদেশের যত মুসলিম ভাই বোন
ইহাদের কথা স্মরি' বুকে পাবে পুলকের শিহরণ।

সারাদেশ আজ মাতামাতি করে সাম্প্রদায়িক রণে
সরস্বতীর সারথী হইলে তুমি সে অশুভ খনে।
আকাশের মত বুকখানি তব, তাহার ছায়ার তলে
মুসলিম আর হিন্দু আজিকে গলাগলি পথে চলে।
বাহিরে কলহ হীন সংগ্রাম, এতটুকু ধ্বনি তার
তোমার সরস্বতীর কুটীরে পশেনি একটি বার।

এসবের তরে আজিকে তোমারে জানাব না তস্‌লিম
গৌরবে বুক ভরিবনা ব'লে তুমি মহা-মুস্‌লিম।
এমনি বড় ত কতজন হয়, উর্দ্ধে তাদের ঠাঁই
তাকাইতে যেয়ে ক্ষুদ্র আমরা ঘাড় ভেঙে প'ড়ে যাই।
আকাশের দেশে বসতি তাদের, মাটির প্রদীপ জ্বালি'
মিছেই আমরা গৌরব গাহি' গায়েতে মাখাই কালি।
আকাশ হইতে নামেনা তাহারা, স্কন্ধে করিয়া ভর
বোঝার উপরে বোঝারে চাপায় মোদের মাথার পর।

তোমারও বসতি তেমনি উর্দ্ধে, তবু হয় সন্দেহ
মাটির ঘরের ব্যথা জান তুমি, নহ তাহাদের কেহ।
আকাশ হইতে হয়ত পাইবে বহুদূর দেখিবারে
অনেক উর্দ্ধে আবাস র'চেছ তাই আকাশের ধারে।
দূরে বহুদূরে মাটির কুটীরে অনাহারী ভাই বোন
হয়ত করিছ আকাশে বসিয়া তাহাদের দরশন।
হয়ত তোমার মণিদীপ জ্বালা প্রাসাদের ছায়াতল
ভিজে যায় সেই হতভাগাদের স্মরিয়া চোখের জল।
হয়ত মেঘের পারা—
কোনদিন তুমি ধরায় লুটাবে লইয়া করুণা-ধারা।
তোমার মনের যেটুকু জেনেছি যেটুকু পেয়েছি স্নেহ
আমার আকাশ ধরণী ব্যাপিয়া জাগে এই সন্দেহ।
তব তরে তাই সাজায়ে এনেছি এ মোর ধানের খেত
সুদূর গাঁয়ের আশা নিরাশার বেদনার সঙ্কেত।

গোবিন্দপুর
ফরিদপুর

গুণমুগ্ধ
জসীম উদ্‌দীন

এই বইএ ধান-খেত বানান করিতে আমি 'ক্ষ' ব্যবহার করি নাই। যদিও "ক্ষেত্র" হইতে "খেত" শব্দের উৎপত্তি কিন্তু খেত উচ্চারণ করিতে আমরা ক্ষ'র ধ্বনি রাখি না।

'বাপের বাড়ীর কথা' ও 'রাখালের রাজগী' কবিতা দুইটি আমার অনেক কালের লেখা। ইহাতে প্রথম বয়সের কাঁচা হাতের অনেক ছাপ আছে। সেকালে কবিতা দুইটি কারও কারও ভাল লাগিয়াছিল। আর এই বইএর সঙ্গতি হিসাবেও ইহাদের মূল্য আছে বলিয়া কোন রকম পরিবর্ত্তন না করিয়া কবিতা দুইটিকে এই পুস্তকে স্থান দিলাম। বইএর দাম যথাসম্ভব অল্প রাখার ব্যবস্থা করা হইল।

মৌলবী মহ্‌ফুজার রহ্‌মান খাঁ সাহেব না হইলে হয়ত এই পুস্তক ছাপান আমার পক্ষে অসম্ভব হইত। কারণ কবিতাগুলির কপি আমার কাছে ছিল না। নানান মাসিক পত্র ঘাঁটিয়া তিনি এই বিক্ষিপ্ত রচনাগুলির পঙ্কোদ্ধার করিয়াছেন। সুসাহিত্যিক বিনোদভূষণ ঘোষ, প্রসিদ্ধ গল্প লেখক বিমল মিত্র, কিশোর শিল্পী শ্রীমান্ আবুল কাশেম ও আরও কয়েক জন বন্ধু এই পুস্তক প্রকাশে আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহাদের সবারই কাছে কৃতজ্ঞ রহিলাম।

আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ গবাদা' (ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর) এই পুস্তকের সুন্দর প্রচ্ছদ পটখানি আঁকিয়া দিয়াছেন। তাঁহাকেও আমার সহস্র ধন্যবাদ।

জ, উ

কবির আর সব বই

রাখালী	১৲
নক্সী কাঁথার মাঠ	১৲
বালুচর	১৲
রঙিলা নায়ের মাঝি	যন্ত্রস্থ
সুজন বে'দের ঘাট	যন্ত্রস্থ
হাসু	যন্ত্রস্থ

সূচীপত্র

ও আমার সোনার খেতের ধান,
সারা মাঠে জড়িয়ে আছিস
এই কলজেখান।

চার ধারে তোর লুটিয়ে আকাশ
কালো বনের দোলায় বাতাস ;
কাঁচা শীতের রোদ ঝরে গায়
শিশু রবির দান ;

সাধ ক'রে কি মাটির সাথে
বানাই মাটির ঘর,
ধানের পাতার বাতাস যে পাই
শু'য়ে মাটির পর ;

ঝলমল বসন টানি
দোলে মাটির স্বরগ খানি ;
গর্ব্ব হ'লে মাটিতে তাই
ছোয়াই মাটির প্রাণ।

ধান খেত

পথের কেনারে পাতা দোলাইয়া করে সদা সঙ্কেত
সবুজে হলুদে সোহাগ ঢুলায়ে আমার ধানের খেত।
ছড়ায়-ছড়ায় জড়াজড়ি করি বাতাসে ঢলিয়া পড়ে,
ঝাঁকে আর ঝাঁকে টিয়ে পাখিগুলি শুয়েছে মাঠের পরে।
কৃষাণ ক'ণের বিয়ে হবে তার হলদি কোটার শাড়ী,
হলুদে ছোপায় হেমন্ত রোজ কচি রোদ-রেখা নাড়ি।
কলমী লতায় গহনা তাহার গড়ার প্রতীক্ষায়
ভিন্-দেশী বর আসা যাওয়া করে প্রভাত সাঁঝের না'য়।

পথের কেনারে মোর ধানখেত, সবুজ পাতার পরে
সোণার ছড়ায় হেমন্তরাণী সোণা হাসিখানি ধরে।
শরৎ সে কবে চ'লে গেছে তার সোণালী মেঘের ছটা
আজো উড়িতেছে মোর এই খেতে ধরিয়া ধানের জটা।

মাঝে মাঝে এর পাকিয়াছে ধান, কোনখানে পাকে নাই,
সবুজ শাড়ীর অঞ্চলে যেন ছোপ লাগিয়াছে তাই।
অজান গাঁয়ের কৃষাণকুমারী এইখান দিয়ে যেতে
সোণার পায়ের চিহ্নগুলিরে গেছে এর বুকে পেতে।

মোর ধানখেত, এইখানে এসে দাঁড়ালে উচ্চশিরে
মাথা যেন মোর ছুঁইবারে পারে সুদূর আকাশটিরে।
এইখানে এসে বুক ফুলাইয়া জোরে ডাক দিতে পারি,
হেথা আমি করি যা খুসী তাহাই, কারো নাহি ধার ধারি।
হেথায় নাহিক সমাজ-শাসন, নাহি প্রজা আর সাজা,
মোর খেত ভরি ফসলেরা নাচে, আমি তাহাদের রাজা।
এইখানে এসে দুঃখের কথা কহি তাহাদের সনে
চৈত্র দিনের ভীষণ খরায় আষাঢ়ের বরিষণে।

কৃষাণী-ক'ণের কাঁকণের ঘায়ে ছিঁড়িয়া বুকের চাম
এই ধান খেত নয়নের জলে ভাসিয়েছি অবিরাম।
এইখানে বসে রাতের বেলায় বাশের বাঁশীর সুরে
মোর ব্যথাখানি ছড়ায়েছি তার সুদূর কৃষাণ-পুরে।
এই ধানখেতে লুকাইয়া তার গোপন স্মৃতির চিন্
দেখিয়া দেখিয়া কাটিয়া গিয়াছে কত না দীর্ঘ দিন।

পথের কেনারে দাঁড়ায়ে রয়েছে আমার ধানের খেত,
আমার বুকের আশা নিরাশার বেদনার সঙ্কেত।
বকের মেয়েরা গাঁথিয়া যতনে শ্বেত পালকের মালা
চারি ধারে এর ঘুরিয়া ঘুরিয়া সাজায় সোণার ডালা।
তাল-বৃক্ষের উঁচু বাসা ছাড়ি বাবুই পাখির দল
কিসের মায়ায় সারা খেত ভরি ফিরিতেছে চঞ্চল।

মাঝে মাঝে তারে জালে জড়াইয়া টেনে নিয়ে যেতে চায়,
সকাল সাঁঝের আলো-ছায়া-ঘেরা সোণালী তটের ছায়।
শিশির তাহারে মতির মালায় সাজায় সারাটি রাতি,
জোনাকীরা তার পাতায় পাতায় দোলায় তারার বাতি।

পল্লী-বর্ষা

আজিকার রোদ ঘুমায়ে পড়িয়া ঘোলাটে মেঘের আঁড়ে
কেয়া-বন-পথে স্বপন বুনিছে ছল ছল জল-ধারে।
কাহার ঝিয়ারী কদম্ব-শাখে নিঝ্‌ঝুম নিরালায়
ছোট ছোট রেণু খুলিয়া দেখিছে অস্ফুট কলিকায়!
বাদলের জলে নাহিয়া সে-মেয়ে হেসে' কুটি কুটি হয়—
সে-হাসি তাহার অধর নিঙাড়ি' লুটাইছে বনময়।
কাননের পথে লহর খেলিছে অবিরাম জল-ধারা—
তারি স্রোতে আজি শুক্‌নো পাতারা ছুটিয়াছে ঘরছাড়া।
হিজলের বন ফুলের আখরে লিখিয়া রঙীন চিঠি
নিরালা বাদলে ভাসায়ে দিয়েছে না জানি সে কোন্‌ দিঠি!
চিঠির উপরে চিঠি ভেসে যায় জনহীন বন-বাটে,
না জানি তাহারা ভিঁড়িবে যাইয়া কার কেয়া-বন-ঘাটে!
কোন্‌ সে বিরল বুনো ঝাউ-শাখে বুনিয়া গোলাপী শাড়ী—
হয়ত আজিও চেয়ে' আছে পথে কানন-কুমার তারি!
দিকে দিগন্তে যতদূর চাহি, পাংশু মেঘের জাল
পায়ে জড়াইয়া পথে দাঁড়ায়েছে আজিকার মহাকাল।

গাঁয়ের চাষীরা মিলিয়াছে আসি' মোড়লের দলিজায়,—
গল্পে গানে কি জাগাইতে চাহে আজিকার দিনটায়!
কেউ বসে' বসে' বাখারী চাঁচিছে, কেউ পাকাইছে রসি,
কেউবা নতুন দোয়াড়ীর গায়ে চাঁকা বাঁধে কসি' কসি'।

কেউ তুলিতেছে বাঁশের লাঠিতে সুন্দর ক'রে ফুল ;
কেউবা গড়িছে সারিন্দা এক কাঠ কেটে' নিভূ'ল।
মাঝখানে বসে' গাঁয়ের বৃদ্ধ, করুণ ভাটীর সুরে
আমীর সাধুর কাহিনী কহিছে সারাটি দলিজা জুড়ে'।

লাঠির উপরে, ফুলের উপরে আঁকা হইতেছে ফুল,
কঠিন কাঠ সে সারিন্দা হয়ে বাজিতেছে নিভূ'ল।
তারি সাথে সাথে গল্প চলেছে,—আমীর সাধুর না'ও,
বহু দেশ ঘুরে' আজিকে আবার ফিরিয়াছে নিজ গাঁও।
ডাব্বা হুঁকাও চলিয়াছে ছুটি' এর হ'তে ওর হাতে,
নানান্ রকম রসি বুনান-ও হইতেছে তার সাথে।
বাহিরে নাচিছে ঝর ঝর জল, গুরু গুরু মেঘ ডাকে—
এ সবের মাঝে রূপ-কথা যেন আর-রূপকথা আঁকে!
যেন ও-বৃদ্ধ গাঁয়ের চাষীরা, আর ওই রূপ-কথা,
বাদলের সাথে মিশিয়া গড়িছে আরেক কল্প-লতা।

বউদের আজ কোনো কাজ নাই, 'বেড়ায়' বাঁধিয়া রসি
সমুদ্রকলি সীকা বানাইয়া নীরবে দেখিছে বসি'।
কেউবা রঙীন কাঁথায় মেলিয়া বুকের স্বপন খানি
তা'রে ভাষা দেয় দীঘল সূতার মায়াবী আখর টানি।
বৈদেশী কোন্ বন্ধুর লাগি' মন তার কেঁদে' ফেরে—
মিঠে-সুরে-গান কাঁপিয়া রঙীন ঠোঁটের বাঁধন ছেঁড়ে।

আজিকে বাহিরে শুধু ক্রন্দন ছল ছল জলধারে,
বেণু-বনে বায়ু নাড়ে এলোকেশ, মন যেন চায় কারে।

জলের ঘাটে

নদীর কূলে কেয়ার বন, তাহার নীচে ঘাট,
সেই ঘাটেতে ডুব দিয়েছে দিঘল গেঁয়ো বাঁট।
সেখান দিয়ে জল্‌কে যেতে পল্লী-বধূর দল
দোলায় ঘড়া, এলায় চুল, বাজায় পায়ে মল।
সারি সারি কাঁখের ঘটে কাঁকণ বাজে র'য়ে,
দেবারতির প্রদীপ-মালা চলছে যেন ব'য়ে।

কারো পরণ হলুদ শাড়ী, কারো পরণ লাল,
কারো শাড়ী নীলাম্বরী, কারো বা 'মেঘ-জাল'।
রঙের রঙের শাড়ীর লহর দুলছে রঙের বায়—
মেঘের বহর দুলছে যেন রঙিন সাঁঝের গায়।
দু'ধারে মাঠ সুদূর-ছাওয়া—সবুজ পারাবার
—সেই সাগরে ওরাই যেন করছে পারাপার।

রঙের রঙের শাড়ী ত নয়, শতেক রঙের পালে
বিদেশী কোন্ হাওয়া-কুমার জড়িয়ে রঙের জালে।
চলছে তারা এ-ওর সাথে নানান কথা ক'য়ে—
গ্রাম্য কবির কাব্য যেন চলছে সাথে ব'য়ে।
শুনতে তাহা হয়ত মিঠে, চুড়ির গীতির মত,
হয়ত তাহা অমনি রঙীন, রঙীন শাড়ী যত।
নদীর ঘাটে এসে তারা ঘট ভরিয়া জলে
সারাটি গাঙ ওলট-পালট করে সানের ছলে।

কারো খোঁপার ফুল খ'সে যায়, কারো গলার মালা,
মাটির ঘড়া জড়িয়ে বুকে ভাসে বা কেউ বালা।
আলতা-রাঙা চরণখানি ঘসে বা কেউ তীরে,
কেউ বা গায়ে হলুদ-বাটা মাখায় ধীরে ধীরে।

'ভেসাল' মেলে জেলের ছেলে ঢুলছে ঘুমে, হায়!
জাল ছিঁড়ে তার মাছ পালাল, খেয়াল নাহি তায়।
ওই মেয়েদের জল-ভরণে যে ঢেউ জলে ভাঙে
হয় ত আরেক কূল ঘেসে তা কুলের বাঁধন মাঙে।
হয় ত ওদের রঙিন পায়ের আলতা-গোলা জল
কখন কখন এপার কারো মন করে চঞ্চল।
হয় ত কেহ চলতে পথে ওদের নয়ন হ'তে
বিনা-তারের তার পেয়ে যায় অমনি কোন মতে।

এই ঘাটেতে নিতুই ওরা জলের খেলা সেরে'
ভরা কলস 'কাঙ্খে' নিয়ে ঘরের পানে ফেরে:
পথের পরে রাঙা পায়ের আখর এঁকে যায়,
আঁচল-ভেজা জলের ধারা ছিটায় তারি গায়!
তারি শীতল পরশ পেয়ে মাঠের ধূলো বুঝি
রাঙা পায়ের ঘুমূলি স্বপন দেখছে নয়ন বুঁজি।

এই ঘাটেরি একটি ধারে কুমার-গাঙের কূলে
কদম্ব গাছ এলিয়ে শাখা দুলছে ফুলে ফুলে।
পাতায় পাতায় বুনিয়ে যেন সবুজ রঙের জাল
কোন বাতাসে বাঁধবে ব'লে বাড়িয়ে আছে ডাল।
তাহার ফাঁকে যায় যে দেখা খণ্ড-নীলের মায়া,
সেখান দিয়ে টুকরো রোদের ঝরে সোণার কায়া।

বাতাস দোলায় গাছের শাখা, তাহার সুরে সুরে
ছোট ছোট রোদের গুঁড়ো তলায় নাচে ঘুরে।
এই গাছেরি হেলান দিয়ে বিগান গাঁয়ের ছেলে
উদাসী তার বাঁশীর সুরে বুকখানি ছ্যায় মেলে।

গাঁর মেয়েরা চলতে ঘরে ভেবে না কুল পায়,
জল ভরিতে কার কথা ও বাঁশীর সুরে গায়।
কেউ বা ভাবে সুরখানি তার বাঁধবে বাহুর ডোরে,
কেউ ভাবে তার গানখানিরে চুমোয় দেবে ভরে।

কারো কারো হয় বা মনে, তাহার রাঙা মুখে
যে রঙ ঝরে ওই বাঁশী তা গাইছে মন-সুখে।
রাখাল সে'ত বাঁশীই বাজায় আপন মনে একা,
ওই মেয়েদের বুকে সে সুর আঁকে নানান রেখা।
কোন্ নারী সে ভাগ্যবতী যাহার কথা ল'য়ে
ওই বিদেশীর বাঁশী আজি ফিরছে ভুবন ব'য়ে।

কৃষাণী দুই মেয়ে

কৃষাণী দুই মেয়ে
পথের কোণে দাঁড়িয়ে হাসে আমার পানে চেয়ে'।
ওরা যেন হাসি খুসীর দুইটী রাঙা বোন,
হাসি-খুসীর বেসাত ওরা ক'রছে সারাখন।
ঝট্‌রা মাথায় কোঁকড়া চুলে লেগেছে খড়কুটো,
তাহার নীচে মুখ দু'খানি যেন আপেল দুটো।
সেই মুখেতে কে দু'খানি তরমুজেরি ফালি
বেঁধে রাঙা ঠোঁটের শোভা দেখছে যেন খালি।
একটি মেয়ে লাজুক বড়, মুখর আরেক জন,
লজ্জাবতীর লতা যেন জড়িয়ে গোলাপ বন।

একটি হাসে, আর সে হাসি লুকায় আঁচল কোণে,
রাঙা মুখের খুসী মিলায় রাঙা শাড়ীর সনে।
পউষ-রবির হাসির মত আরেক জনের হাসি,
কুয়াসাহীন আকাশ ভরে টুকরো-মেঘে ভাসি।
চাষীদের ওই দুইটি মেয়ে ঈদের দুটি চাঁদ,—
যেই দেখেছি পেরিয়ে গেল নয়নপুরীর ফাঁদ।

মুন্সীসাহেব

কাজল ডাঙার বছির মিঞা—মুন্সী যদিও খেতাবী তার,
তবু তাহার এলেম দেখে মৌলবীরা মানে যে হার।
ভূঁড়িটি তার মনেক তিনেক, বিদ্যে ভরা জাহাজ খানি,
গাঁর লোকদের ভাগ্য ভাল—ডাঙা দিয়েই যায় সে টানি ;
গাঙ দিয়ে তার চললে জাহাজ ঢেউ ভাঙিত এমন জোরে
দুখানি কূল টিকতনা'ক কেবল সামাল সামাল ক'রে।
চলতে পথে মুখ হ'তে তার দিন-এলেমের বচনগুলি
উড়ে যেমন দমকা হাওয়ায় বালুচরের শুকনো ধূলি।
কখন তাহা কাচাপাকা দাড়ীর বহর ভেদ করিয়া
বৃষ্টি শিলার মতন ঝরে সাদা কালো মেঘ ভাঙিয়া।
কয় সে কথা কেতাব দেখে, মানতে যদি না চাও তাহা,
'ছহি সোনা-ভানের' সাথে মিলিয়ে নিও যখন যাহা।
'কাছা-ছাল-আম্বিয়া' আর 'হাজার মছলা' কেতাবখানি
'আমির হামজা' ছাড়িয়ে কথা কয়না সে তা আমরা জানি।

সাত গাঁর লোক নাম শুনে তার চোরের মত কাঁপতে থাকে,
না জানি কোন কসুর দেখে শাস্তি কখন দেয় বা কা'কে।
সাপ্তাহিকের স্তম্ভে যেমন শাহীজর্দ্দা কুয়তেলাহি,
ইত্যিআদির শুভ খবর দিনে দিনে যায় যে গাহি !
তেমনি তার মুখের পরে সব সময়ে রইছে আঁকা—
বিবি-তালাক, হাজার জুতো, নজর-আনা একশ টাকা।
চুল হবে কার লম্বা কত, রাখবে দাড়ী ক'হাত করে,
কতখানি করবে নজর টুপী এবং কাছার পরে,—
এ সব লোকের জানাই আছে একটু হ'লে এদিক ওদিক
মুন্সীসাহেব ফতোয়া দেন কেতাব দেখে কসুর-মাফিক।

পা'জামার দু'গলির মাঝে ঢুকিয়ে সরু পা দু'খানি
ভূঁড়ির পরে জগৎজোড়া আচকানেরে লয় সে টানি।
ভাঙা চালের ছানির মত র'য়েছে তায় হাজার তালি,
সংখ্যাতে তা বে'ড়ে পসার মুন্সীসা'বের আনছে খালি।

মাথায় তাহার পাগড়ী বাঁধা, বগলেতে পুঁথির বোঝা,
লক্ষ লোকের মধ্যে গেলেও এই চেহারা যায় যে খোঁজা।
এই চেহারা যেথায় যাবে জানে খবর সেথায় সবাই—
পোলাও রুটীর সাথে সাথে করতে হবে মুরগী জবাই।
এই চেহারার সঙ্গে চলে খাঁটি পাকা মুসলমানী,
আরব দেশের ঝাণ্ডা যেন মুন্সীসাহেব চলছে টানি।

তাহার আগমনের সাথে দূরের বাঁকা পথটি ধ'রে
অতীতকালের ইসলামী দিন বেড়িয়ে যায় গ্রামটি ভরে।
পাট বাছে যে শুকুর মামুদ, ধান কাটে যে ছদন মিঞা,
ছন্নুর বেটা সদরদ্দি কি ক'রে বা লই চিনিয়া,—
মুন্সীসাবের মফেলে আজ নতুন জামা সবার গায়ে,
মাথা সবার সজিয়ে নেছে রঙ-বেরঙের টুপীর ছায়ে।
মুন্সীসাবের মফেল ত নয়, রঙ-বেরঙের ফুলের বাজার
পূর্ণমাসীর চাঁদ ঘিরে আজ তারা-ফুলের উড়ছে বাহার।
গন্ধ তাদের ছড়ায় পবন আতর গোলাপ লোবানেতে
আল্লাহুমা-ছাল্লে-আলা দরুদ-গানের ছন্দে মেতে।
মুন্সীসাহেব মলুদ পড়ে, পুল-ছেরাতের পুলের সেতু—
নাই পাটনী নাই তরণী পার হইবার কোনই হেতু।
নেকী-বান্দা পার হয়ে যায়, বদী-বান্দা ফসকে পড়ে,
নিম্নে নদী উথল পাথল, ঢেউ ভেঙে যায় ফেনার ভরে।

সকল নবী কাঁদবে যেদিন য়্যা-নফছি য়্যা-নফছি ব'লে,
চতুর্দ্দিকে হায় হাহাকার উঠবে ধ্বনি ভীষণ রোলে।
রোজ-হাসরের ময়দানেতে মোর্দারা সব জীবন পাবে—
মাটির পরে কপাল ঠুকি কাঁদবে তারা নানান ভাবে।
অতীতকালের পাপের বোঝা সকল তাদের পড়বে মনে,
কেউ হবে না ব্যথার দোসর দুঃসহ সেই নিদান্-ক্ষণে।

য়্যা-উম্মতি য়্যা-উম্মতি কাঁদবে আমার দীনের রছুল,
হতভাগা মোমীনগণে সেদিন তাহার পড়বে না ভুল।
কেঁদে কেদে বলবে, খোদা, মোর উম্মতের সকল গুণা
মাফ ক'রে দাও—মাফ ক'রে দাও মোর পুণ্যের লইয়ে ছুনা।

মুন্সীসাহেব মলুদ পড়ে, বুক ভেসে যায় নয়ন জলে—
তারি দোলায় চতুর্দ্দিকের সবার হিয়া যায় যে গ'লে।
মুন্সীসাহেব বয়ান করেন আতসেরি লেবাছ প'রে
শয়তান যে কাঁদবে সেদিন দোজখেরি দুয়ার ধ'রে।
সেখান দিয়ে চলবে হেঁটে এই তুনিয়ার হাজার পাপী,
দোজখ-ভরা আগুন দেখে ভয়ে পরাণ উঠবে কাঁপি।
সেই আগুণের এমনি জ্বালা লক্ষ শিখা বাড়িয়ে দিয়ে
লাখ বছরের ভোখ নিয়ে সে ফিরবে আকাশ জমিন নিয়ে।
মাথার পরে হাজার রবি হান্‌বে সেদিন তপ্ত নিশাস,
জ্বলবে তাতে সপ্তধরা জ্বলবে আকাশ জ্বলবে বাতাস।
ভাইরা আমার, এই দোজখের আজাব হ'তে রেহাই কি চাও!
আজকে তবে সহজ সরল দীনের পথে চরণ বাড়াও।

বেহেস্তেরি তুয়ার ধ'রে দাঁড়িয়ে আছেন দীনের রছুল,
মোমীন জনের সবার তরে আজকে তাহার পরাণ আকুল।
সেই দরজা পার হইয়া মুছল্লিরা যায় চ'লে যায়
জরীর জামা জরীর জুতো বেহেস্তি লেবাছ প'রে গায়।
পুত্রহারা মায়ের সাথে হবে সেথায় ছেলের দেখা,
মুখ হ'তে তার পড়বে ঝরে নয়া চাঁদের খুসীর রেখা।
লক্ষ বছর পার হইয়া মরা পতি আসবে হাসি'
জনম-তুখী বিধবাদের অশ্রুজলের ধারায় ভাসি।
শিশুকালেই যেই খোকাটি মরে ছিল মায়ের কোলে
জিন্নাতে সে যাবেই না'ক, মা না তাহার সঙ্গী হ'লে।
তখন খোদার আদেশ পেয়ে দোজখ হ'তে জননী তার
ভেস্তে যাবে হাত ধরিয়ে পুণ্য পেয়ে ছোট্ট খোকার।

বেহেস্তের সে কী বর্ণনা, ভাইরা আবার বলব কত—
সোণার বরণ ডালিম গাছে ফল ঝুলিছে হাজার শত।
তলায় তলায় হুর-পরিরা কখন নাচি কখন গাহি
বেহেস্তি ফুল ছড়িয়ে বায়ে চ'লছে সোণার পন্থ বাহি।
সেইখানেতে দেখতে পাবে লায়লী এবং মজনু চলে,
শিরীঁ-ফরহাদ ফুলের মালা পরায় হেসে এ ওর গলে।
মা-ফাতেমা হাসেন হোসেন দুই ছেলেরে জড়িয়ে বুকে
কারবালারি করুণ গাঁথা স্মরণ করি কাঁদবে দুখে।
জমীন সেথা সোণার বরণ, গাছের পাতায় রঙের খেলা,
দুপুর সেথা হবেই না'ক, কেবল সকাল সন্ধ্যাবেলা।
মেঘে মেঘে ঢেউ খেলিয়া নানান রঙের জলের ধারা
ফুলের রেণুর সুবাস লয়ে পড়বে ঝ'রে শিশির পারা।...

এই ভাবেতে মুন্সীসাহেব বেহেস্তেরি বয়ান করি
সহজ সরল গাঁর চাষীদের দেয় যে সকল পরাণ ভরি।
সবার চোখেই জলের ধারা দিন-আখেরীর ভাবনা লয়ে
কোন্ সুদূরের সোণার দেশে মন ছুটেছে উধাও হয়ে।
মুন্সীসাহেব বুঝতে নারে, বেহেস্তেরি বয়ান করি'
আরেক নব-বেহেস্তেরে মফেলেতে আন্‌ছে ধরি।
সেখানেতে মোমের বাতি জ্বলছে ঘুরি সোণার শিখায়,
লোবাণেরি উড়ছে ধূঁয়া বেহেস্তি-সুবাস মেখে গায়।

খনে খনে গাঁর চাষীরা গদগদ কণ্ঠ লয়ে
আল্লাহুমা-ছাল্লে-আলা পড়ে দরুদ একিন হয়ে।
নানান বুকের সুর যে সেথা লোবাণেরি ধূয়ায় ভেসে'
সাত-তবক আশমান পেরিয়ে যায় ভেসে কোন সুদূর দেশে।
খোদার আরশ-কুরছি পরে হয়ত সে সুর মুরছি পড়ে,
মুন্সীসাহেব মলুদ পড়ে মূর্খ গেঁয়ো চাষীর ঘরে।
দোষে গুণে পয়দা মানুষ, কি হবে তা' হিসাব করি,
বছির মিঞা রহুন গাঁয়ে এমনিতর মলুদ পড়ি।

স্বপনপ্রিয়া

আর কতদিন রহিবে সজনি, মোর কল্পনা হ’য়ে,
স্বপনে স্বপনে আর কতকাল ভাসিবে আমারে ল’য়ে।
আজি দেখে যাও দেবের দেউলে বনের শৃগাল নাচে,
শ্মশানের ভূত আসিয়া এখন পূজার প্রসূন যাচে।
তোমারে ভাবিয়া জীবনের পথে করিয়াছি নানা ভুল,
যারে তারে আমি সঁপিতে গিয়াছি দেব-চরণের ফুল।
ধূপের সরায় ছড়ায়েছে তারা ভিজা তুষ আর বালি,
সোনার স্বপন ঢাকিছে তা আজ উগারি’ ধুঁয়ার কালি।
মোর চন্দনে মিশায়েছে তারা কেউটে সাপের বিষ,
তীব্র তাহার দহন-জ্বালায় কাঁদে মোর দশদিশ।

আর কতকাল তাহাদের গেহে কাঁচা উনানের তলে
ভিজা কাষ্ঠেতে আগুন জ্বালায়ে তিতিব নয়ন জলে!
লোহার কালাই সিদ্ধ হয় না,—আশারো নাহিক শেষ,
ভিজা কাষ্ঠেরে ফুঁকিয়া ফুঁকিয়া ভিজানু বুকের বেশ।

তুমি এসে দেখা দাও
মোর কল্পনা-তটিনীর জলে বাহিয়া সোনার না’ও।
জীবনেতে আমি বড় যে ক্লান্ত—বড় যে শ্রান্ত দেহ,
বহু দেশ আমি ঘুরিয়া ফিরেছি খুঁজিয়া বুকের স্নেহ।
খুঁজিয়াছি আমি বুক-ভরা বুক, ফুল-ভরা ফুল হাসি;
মন-ভরা মন—সে মনের লাগি মোর মন সন্ন্যাসী।

শুধু মরীচিকা, হায় !
যত খুঁজিলাম ধূ ধূ মরুবালু উড়িছে উষ্ণ বায় ।
মায়ার জগৎ, ফুলের হাসিতে দাবানল হুতাশন
ঢাকিয়া রেখেছে, ছুঁইতে গেলেই পোড়ায় তনু ও মন ।
ফুলের আড়ালে লুকায়ে রেখেছে তীব্র কাঁটার জ্বালা,
চন্দন তরু বেড়িয়া ছুলিছে দহন নাগের মালা ।
তুমি এসো সই, তোমার জীবন এদের মতন নয়,
তুমি শেখ নাই কথা দিয়ে কথা কেমনে ফিরায়ে লয় ।
খেলার পুতুল ক'রে,
তুমি খেল নাই ছিনিমিনি খেলা পরের পরাণ ধ'রে ।
তুমি এস সই, তোমার অঙ্কে রাখিয়া শ্রান্তকায়
বালকের মত কাঁদিয়া কাঁদিয়া আঁচল ভিজাব, হায় !

আমার ঘরের দিবস রজনী ছ'খানি ছুখের চাল,
ঘসির অনল জ্বালায়ে সেথায় কাটায়েছি এতকাল ।
সাপের মাথায় রাখিয়া সেথায় আপন বুকের মণি
ফুলের মধুতে পোষণ ক'রেছি কাল অজগর ফণি ।
তা'রা নাহি বশ মানে,
আঁধার ঘরেতে না জানি কখন বিষের কামড় হানে ।
আগের দরজা বন্ধ ঘরের, পিছন দরজা খুলি'
স্বজন বলিয়া ডাকাতেরে আমি এনেছিনু ঘরে তুলি
হায় নিদারুণ, রতন মাণিক লুণ্ঠন করি মোর
সমুখের দ্বার খুলে চ'লে গেল আমারে করিয়া চোর ।

তুমি কভু সই এমন হবে না, তোমার ফুলের প্রাণ
শুধু হাসি জানে আর জানে দিতে ফুলের বুকের ঘ্রাণ।
মোর যত দুখ তোমারে শুনাব, বাঁশীর করুণ সুরে
বনের হরিণে ডেকে এনে বুকে বিষ বাণ দেয় পূরে ;
ওরা নিষ্ঠুর, আগুন জ্বালায়ে পোড়ায় বনের বুক,
কি দুঃখে বন পুড়ে ছাই হ'ল দেখে না ফিরায়ে মুখ !

তুমি সই কভু এমন হবে না,—যাহার যত না দুখ
ভাষা পাইবারে খুঁজিয়া ফিরিছে তোমার কোমল বুক
জগতের যত দুঃখ বেদনা যত হাসি আর গান
তোমার মাঝারে ধরিয়া ধরিয়া করিব যে আমি পান।
তুমি হবে মোর বাজাবার বাঁশী, তোমার করুণ সুরে
আমার মনের যত কথা সখি ফিরিবে ভুবন ঘুরে।
সে সুরের গাঙে ভাসাইয়া দিব আমার আঁখির জল,
যারা ব্যথা দেয় তাদেরও নয়নে নামিবে সেদিন ঢল।
তুমি এসো সই আর কতকাল র'বে কল্পনা হ'য়ে,
আঁধার জমেছে দেবতাবিহীন এ আঁখির দেবালয়ে।
কদম কেয়ার আহ্বান লিপি পাঠায়েছি তব দেশে,
তুমি এসো আজ নব আষাঢ়ের কাজল মেঘের বেশে।

আমার পূজার ফুল

মোর অগোচরে হয় ত তোমার চরণে পেয়েছে কূল।
দেবতা জেনেই দিয়েছিনু মালা, তারা যে দেবতা নয়,
অসুর হইয়া দেবতার দান কেমন করিয়া লয় !

আমার হৃদয়ে আছিল তৃষ্ণা, চাহি মোর দেবতারে
পদে পদে তাই ভুল ক'রে সখি ডাকিয়াছি যারে তারে।
স্তবের ভারেতে হৃদয় আকুল, না মানে বাঁধের মানা,
সেদিন সজনি, পথে পথে তাই ভুল করিয়াছি নানা।
সে-সব হয় ত মোরি অপরাধ, তবু তার গুরুভার
এমন নয়'ক তোমারে পাইতে আছে কোন বাধা তার।
দেবতারে আমি চেয়েছিনু সখি, যদি নাহি চিনে থাকি,
অগোচরে মোর পূজার কুসুম দেবতা ল'য়েছে ডাকি।
যত গান আমি ভাসায়েছিলাম অশ্রুমতীর জলে,
আজিকে তাহারা বাসা বাঁধিয়াছে তোমার মেঘের দলে।
সেই মেঘভার অলকে দুলায়ে এস গো স্বপন-প্রিয়া
আমার বিজলী হাসিবে তোমারে লতা-বন্ধন দিয়া।

ফুলের পূজারী

আজি এ রাতেরে ঘুমোতে দেব না, আঁধারে পাতিয়া বুক,
গণিয়া দেখিব এ জীবনে আরো লেখা আছে কত দুখ।
এখন হয়ত ঘুমায়েছ তুমি, উদাস পথিক বায়ু,
তোমার খোঁপার মালায় জড়ায়ে মাগিছে রাতের আয়ু।
হয় ত তোমার জানালার পথে অপ্সরী তারাগুলি,
আকাশ হইতে ছড়াইছে আনি নীল স্বপনের ধূলি।
শিয়রে প্রদীপ নিবিতে চাহে না, ফুরায়ে এসেছে তেল,
তবু ওই মুখে ছড়াইতে চাহে সোণালী আলোর খেল।
এখন হয় ত ঘুমায়েছ তুমি—আহা তুমি ঘুম যাও,
আমার বুকের এ বেদনা যেন তুমি না জানিতে পাও।
তোমরা র'চেছ পুষ্পের ডালি, আমি যেন ভুল করি
আমার দেশের দুঃখের কীট নাহি দেই সেথা ভরি।

আমি জানি দেবি! তোমার কবির যশের কিরীট খানি,
হিমালয় ভেদি' উপরে উঠেছে সৌর-কিরণ হানি।
সে অমর, তুমি তাহারি ছোঁয়ায় হইবে অমরাবতী,
বাঁশী বাজাইয়া রচিবে সে তব ত্রিকালে চলার গতি।
যে পুষ্প ঝরে নিদাঘের শ্বাসে, বরষ দৈত্য আসি,
রূপের দেউল কঠিন চরণে ভেঙে যায় ক্রুর হাসি।
সে পারে তাদের ধরিয়া রাখিতে, কঠিন বাহুর বাঁধে
তব যৌবন বেঁধে সে রাখিবে অনন্ত আয়ু ফাঁদে।

সে কবিরে মোর জানিয়ো প্রণাম, আর ব'লে দিও তারে,
আমার লাগিয়া কোন দুখ কভু সহিতে হবে না কা'রে।
অতি হীন প্রাণ, পথের কোণায় নিজেরি দৈন্য লয়ে,
রাতেরে লুকায়ে দিনেরে লুকায়ে রহি জড়সড় হ'য়ে।
তবু মাঝে মাঝে এই মনে হয়, যদি কোন দেবতার
দেখা পাইতাম, তাঁহারে সঁপিয়া সব দৈন্যের ভার,
বলিতাম আমি ধন্য হইব তোমারে পরশ করি,
এ বীণা আমার হইবে অমর তোমার মন্ত্র স্মরি।
তাই এসেছিনু তোমাদের গেহে পূজার প্রসুন ব'য়ে—
বরণ ডালায় প্রদীপ সাজায়ে এসেছিনু দেবালয়ে।
মোর গানে কেহ ধন্য হইবে এমন স্পর্দ্ধাভার,
এ শুধু তোমার কবিরই রহিল, আর হবে নাক কার।
আমি এসেছিনু তোমার মাঝারে অগাধ তৃষ্ণা গড়ি,
নিজেরে করিব সুন্দরতর কঠোর সাধনা করি।

তোমার কবিরে ব'লে দিও দেবী, ক্ষুদ্র এ বাহুখানি,
জানি, তাই বৃথা রামধনু লয়ে করি না'ক টানাটানি।
তাঁহার বাহু যে জগৎ জুড়িয়া, তারকা-চন্দ্র-রবি
ইচ্ছা করিলে ছিঁড়িয়া আনিতে পারে সে এখনি সবি।
তৃষ্ণারে মোরা বড় ক'রে জানি, নহে তৃপ্তির লাগি,
ত্রিযামা যামিনী বে-ঘুম শয়নে একা একা ব'সে জাগি।
রামধনুকেরে পাই নাই ব'লে তাতে কোন খেদ নাই,
চক্রবালের ললাটে দেখেছি রেখা-রঙ রোশ্‌নাই।
পাখায় পাখায় সরু জাল পাতি বে-বুঝ পাখীর দল,
সারাটি গগন তাহারে ধরিতে ঘুরে মরে চঞ্চল।

তারা নাহি জানে যে মেঘের গলে দোলে সাতনরি হার,
গগনে গগনে ফেরে সেই মেঘ সন্ধান করি তার।

তোমার কবিরে ব'লে দিও দেবী, যারা শুধু ফুল চায়,
ফুল তাহাদের, ফুলের সাধ্য নাহি কারো হ'তে হায়।
তাই সেথা মোর নাহি অভিযোগ আবেদন-নিবেদন,
যতটা তাহারে লেগেছিল ভাল ততটা ভরেছে মন।
ফুলেরে যাহারা মালায় গাঁথিয়া গলায় পরিয়া রাখে,
তাহাদের ফুল এক রাত্রের, তার বেশী নাহি থাকে।
এই ধরণীর ফুলের উপরে যারা চাহে অধিকার,
ফুলেরে তাহারা বোঝে নাই, শুধু জেনেছে অহঙ্কার।
ফুল আকাশের—ফুল বাতাসের—ফুল শিশিরের সাথী,
ফুলেরে ফোটাতে রবি-শশী-তারা শূন্যে দোলায় বাতি।
যারা সে ফুলের চারিধার ঘেরি রচে আবরণ পাশ,
তাহাদের ফুল শুকায় দু'দিনে না ছড়াতে ফুল-বাস।

জানিতাম দেবী, ফুলের দেশেতে যারা রচিয়াছে ঘর,
ফুলের মতন বড় সুন্দর তাহাদের অন্তর।
ফুলের প্রেমেতে মজিয়াছে যারা তাদের শুভ্র মন,
দেশে দেশে ফেরে ফুল পূজারীরে করিয়া নিমন্ত্রণ।
আজি বুঝিলাম তোমার দেশেতে এমনো পূজারী আছে,
কুসুমের গান ঈর্ষা বিষেতে ভরা যাহাদের কাছে।
দেবের দেউলে মজার পূজারী! শুনিয়া ভজন গান,
মন্দির ছাড়ি পালায় সুদূরে আঙ্গুলে ঢাকি কাণ।

আমি কি করিব, দেবতার মনে যদি ভাল লাগে তায়,
রবি-কর যদি মেঘ বেষ্টনে নিজেরে ঢাকিতে চায়,
মোর ফুল যদি বাঁধা পড়ে আজ কারো আবরণ জালে,
তার প্রতি মোর কোন অভিযোগ হবে নাক কোন কালে।
তারে ব'লে দেবো, যে ফুলের নেশা আমারে পাগল করি
কাঁদাইছে পথে, সে ফুলের কেহ তুমি নহ সুন্দরী !
আমার সে ফুল চির শাশ্বত, অনন্ত তার আয়ু,
অঙ্গে মাখিয়া রেণু গৈরিক আমি তার খ্যাপা বায়ু।

বাপের বাড়ীর কথা

বড়ু তুই আয়, আরো কাছে, মোরে জড়ায়ে ধরিয়া থাক্,
আকাশ ফাটিয়া হাকিয়া উঠিছে কাজল মেঘের ডাক।
এমনই বাদলে মায়ের আঁচলে তোরই মত ছোট মেয়ে,
কচি ছুটি হাতে গলাটি জড়ায়ে জেগে রহিতাম চেয়ে।
ছোট ঘরখানি ছুলিয়া উঠিত ঝাপ্‌টা হাওয়ার বেগে,
বিজলী নাচিত সোনার হারটি কালো মেঘে মেঘে এঁকে।
প্রভাত না হ'তে আম কুড়াইতে ছুটে যাইতাম বনে,
বেতের কাঁটার কঠিন পরশ কেইবা তখন গণে।
সিঁছুরী' গাছের তলায় আসিয়া হর্ষে নাচিত বুক,
এ পোড়া ধরণী কেমনে বুঝিবে আম কুড়া'বার স্থখ।

তলায় তলায় ঘুরিয়া ফিরিয়া কুড়ানো হইলে শেষ,
এনে রাখিতাম মায়ের সমুখে, আজো মনে পড়ে বেশ।
মা তখন মোর কত খুসী হত, কোলের নিকটে ডাকি,
চুমায় চুমায় ছুইটি গণ্ড সিঁছুরেতে দিত আঁকি।
বৈশাখ দিনে কাঠ-ফাটা রোদে কাঁদিত গায়ের চাষী,
দাউ দাউ করা দম্‌কা হাওয়ায় গুমট্ বেড়াত ভাসি।
আমরা তখন কুমারী মেয়েরা "বদনা বিয়ে"র গানে,
সারা মাঠখানি ভরিয়া দিতাম বাদল বিরহী তানে।
বদনার গায়ে হলুদ মাখিয়া কুলার উপরে রাখি,
প্রতি ঘরে ঘরে ব'য়ে ফিরিতাম 'কালিয়া' মেঘেরে ডাকি।

জল ছিটাইয়া গাঁয়ের বধূরা হেসে হত কুটি কুটি,
ঘোমটার তল রাঙিয়া উঠিত রাঙা ফুলগুলি ফুটি।
কুমারী মেয়ের করুণ কাঁদনে গ্রীষ্মের হিয়া গলি,
সারা মাঠ ভরি কাজল মেঘেরা নামিয়া পড়িত ঢলি।
আঁকিয়া বাঁকিয়া জল ছু'টে যেত মাঠে-যাওয়া পথ ধরি,
চাষীর হৃদয় নতুন 'বানের' আশায় উঠিত ভরি।
ছেলেবেলাকার বদনা বিয়ের খেলা-সাথী কেহ কেহ,
হয়তো এখন ঘুমায়ে রয়েছে মাটিতে মিশায়ে দেহ।
হয়তো কাহারো বিবাহ হয়েছে অনেক দূরের দেশে,
হয়তো কাহার এক বুক ব্যথা ঝরিছে বাদল বেশে।

* * * *

বড়ু তোর আজ দিনুর মায়ের মনে কি পড়েনা কিছু ?
যে তোর আঁচলে আম ঢেলে দিতে এসেছিল পিছু পিছু।
তার সাথে মোর বড় ভাব ছিল, ছেলে বেলাকার দিনে,
একদিনো মোর কাটিত না কভু এক সাথে খেলা বিনে।
মোর বিয়ে হলে কাঁদিয়া কহিল "বু'রে! তুই ছেড়ে গেলি,
তোরে ফেলে এই শূন্য কুটিরে কি করে যে আর খেলি।"
সাথীদের সাথে কাঁদিয়ে কাঁদায়ে উঠিলাম শোয়ারীতে,
বাপের বাড়ীর সব ছবিগুলি আঁকিয়া লইয়া চিতে।

তারপর এই তিরিশ বছর আসিয়াছি এই দেশে,
বাপের বাড়ীর কথা মনে হলে আঁখি দু'টি যেত ভেসে

কত যে মানুষ যেত চলে ওই গাঁয়ের পথটি ধরি,
আনমনা আমি চেয়ে থাকিতাম ঘোমটা যে ফাঁক করি।
হায়রে অচেনা, তোরই মাঝে কত খুঁজিয়াছি চেনা মুখ,
নিরাশায় শুধু দহিয়া মরেছি ভাঙ্গিয়া পড়েছে বুক।
সাতে সত্তুরে 'বাজান' আসিলে গলাটি ধরিয়া তাঁর,
আপন দেশের শত খুটি নাটি শুধাতাম বারে বার।
দিনুর মায়েরা কেমন আছে গো ? রাঙা ছুটু কোথা আছে ?
গাজনের বিলে জল উঠেছে কি ডুহার চকের কাছে ?
'সাপলা' পরীরা জল খেলে নাকি কালো জলে মাথা নাড়ি,
কমল মেয়েরা হাসিয়া উঠে কি পরিয়া রঙের শাড়ী ?
যাইবার বেলা কেঁদে কহিতাম, হেথায় আমার মোটে,
ভাল যে লাগেনা, মায়েরে দেখিতে পরাণ কাঁদিয়া ওঠে।
কোঁচার খোটেতে চক্ষু মুছিয়া কহিত বাজান মোরে,
"কি করিব মাগো, এরা যে এখন ছাড়িয়া দেয়না তোরে।"

সেবার বোশেখে ডুলিতে চড়িয়া গেলাম বাপের বাড়ী,
ছেলে বেলাকার সাথীরা তখন অনেকেই গেছে ছাড়ি।
হেলিয়া দুলিয়া শোয়ারী যখন আসিল গাঁয়ের পাশে,
তালের পাতারা কাঁদিয়া উঠিল শোঁয় শোঁয় করা শ্বাসে।
মনে হল হায়, ডুলির কাপড় ছিঁড়ে করি কুটি কুটি,
গাছ পালাগুলি জড়ায়ে ধরিয়া কেঁদে কেঁদে মাথা লুটি।
সেই চেনা পথ, ছায়া বটতল, তাল পুকুরের পাড়ী,
নীড়ে নীড়ে সেই পাখীর কূজন, চাষীদের ছোট বাড়ী।

* * * * * *

হাসিয়া হাসিয়া জননী তখন ডুলির কাপড় তুলি,
কহিল ডাকিয়া, বড়ু এলি নাকি ? এতদিন ছিলি ভুলি !
তারপর সেই উঠানে বসিয়া অতীতের শত কথা,
ঢেউয়ের মতন বুকেতে আসিয়া দিয়ে গেল শত ব্যথা !
ছেলে বেলাকার খেলার সাথীরা কেহ কেহ কাছে আসি,
নয়নে নয়ন মিলাতে যাইয়া আঁখি জলে গেল ভাসি।
মোল্লা বাড়ীর বড়ুরা আসিল, মিনার বাড়ীর সাজু,
ফেলিরা আসিল, নিহাজের মাতা, ছুলিয়ার বোন মাজু।
তাহাদের সাথে হাসিয়া কাঁদিয়া এ পাড়া ও পাড়া ঘুরি,
ভুলে যাওয়া শত স্মৃতিগুলি মোর বুকে লইলাম পুরি।
আমার মায়ের কত ব্যথা ছিল আমারে ছাড়িয়া দূরে,
সেই সব তারা আমারে কহিত এমনই করুণ সুরে ;
বুক যেন মোর জ্বলিয়া জ্বলিয়া পুড়ে হয়ে যেত ছাই,
ধিক্কার হত নারী জনমের, কোন কিছু নাই—নাই !

তারপর সেই আসিবার দিনে সারা গ্রামখানি ভ'রে,
বড় সকরুণ কাঁদন জাগায়ে এলাম তোদের ঘরে।
গেঁয়ো পথ দিয়ে শোয়ারীখানিরে যতখণ গেল দেখা,
উদাসিনী সে যে চাহিয়া রহিল আমার জননী একা।
আকাশ ছোঁয়ান তাল গাছগুলি শেষ দেখা গেল দিয়া,
অচেনার দেশে শোয়ারী চলিল, কাঁদিয়া উঠিল হিয়া।
তারপর এই স্বামীর ভিটায় বহুদিন গেছে কেটে,
বাপের মরার খবর শুনিয়া বুকখানি গেছে ফে'টে।

এত দরদের জননী আমার শুয়েছে কবর দেশে,
আজো তাঁর স্নেহ মোর তরে নাকি মাটি হতে উঠে ভেসে।

* * * * *

বড়ু তুই মোর আরও কাছে আয়, বড় ব্যথা আজ বুকে,
গগন ভরিয়া উতলা মেঘেরা কাঁদিছে আমার দুখে।
ঝিলিকে ঝিলিকে বিজলী নাচিছে বন-পথ করি আলা,
মোর ব্যথা কি ও ছড়ায়ে চলিছে আকাশে দোলায়ে মালা ?
কড় কড় কড় ঝঞ্ঝা হাঁকিছে, ঢল ঢল ঝরে জল,
মনে পড়িতেছে ছোট গেঁয়ো ঘর, ছায়া-ঘেরা বটতল।
মনে পড়িতেছে আঙিনার কোলে হাসি ভরা কার মুখ,
আহারে জননী কোথা গেলি তুই মোরে দিয়ে এত দুখ।

বালুচর

নদীতীরে ওরা বেঁধেছে কুটীর,
শ্যামল শোভায় ঘেরা ;
মাটীরে করেছে ছায়া মায়াবিনী
পল্লীর দুলালেরা।
আম কুঞ্জের শাখাবাহু ধরি,
এলাইয়া পড়ে বাতাসের পরী :
ওদের কুটীরে শুনাই নিতুই—
ঘুম পাড়ানিয়া গান !
নদীতীরে ওরা পাতার কুটীরে
গড়েছে সুখের থান !

নদীতীরে ওরা বেঁধেছে কুটীর,—
বৌ হাসে আঙিনায়,
আদুরে দুলাল বাঁকা গেঁয়ো পথে
ঝাঁজর বাজায়ে যায়।
ওপার হইতে ধান কেটে আনি'
সোনায় সাজায়ে গেঁয়ো ঘরখানি,
সয়ালি পাতায়ে গেঁয়ো ভাই সনে,
বাজায় সুখের বীণ,
বালুচরে ওরা কুটীর বেঁধেছে,
ভুলে গেছে তার চিন

বালুচরে ওরা কুটীর বেঁধেছে
কৃষাণী জলেতে যায়,—
জলের উপর আলপনা আঁকে
কাঁখের কলসী ঘায়।
ভরা ঘট লয়ে ঘরে যায় ফিরে,
বাহুর লতায় বাঁধি নদী নীরে;
পথেতে দেখিয়া কৃষান সখারে,
লুকায় মুখের হাসি,
নদীতীরে ওরা মেলিয়া ধরেছে
সুখের স্বপন রাশি।

বালুচরে ওরা কুটীর বেঁধেছে,
বালুর আঙিনা আঁকি,
কৃষাণী দিয়েছে লেপিয়া মুছিয়া
বুকখানি তার মাখি।
কেউ ভাই হ'য়ে কেউ বোন হ'য়ে,
জীবন কাটায় হাসি গান ল'য়ে;
সখা হ'য়ে কেউ সখী হ'য়ে কেউ,
এ ওরে আদর করে,
বালুচরে ওরা ভুলিয়া রয়েছে,
ওদের বালুর ঘরে!

কুলঙ্কশা সে নদীতীরে ওরা
বেঁধেছে কুটীরগুলি,
বালুর উপরে আখর লিখেছে
একথা রয়েছে ভুলি!

এ উহারে বলে, বড় ভালবাসি !
ছবি আঁকে কেউ দেখে কারো হাসি,
কারো মিঠে কথা ভাল লাগে বলে
স্বপনেতে যায় ভাসি !
বালুচরে ওরা কুটীর বাঁধিয়া
বাজায় বাঁশের বাঁশী !

বালুচরে ওরা কুটীর বেঁধেছে,
—কতকাল—কতকাল !
আর কতদিন ছিন্ন সূতায়
গাঁথিবে মায়ার জাল ?
ঢেউ অজাগর ফেনিল হাসিয়া
বুকের বাঁধন যায় যে নাশিয়া,
বরষায় ওরা ভরা নদী বুকে
জীবন লইয়া ভাসে ;
তবু আর বার বালুচরে ওরা
কুটীর বাঁধিতে আসে !

অবেলায়

কেন   সন্ধ্যায় তুমি এলে—
কনক মেঘের অলকায় আজি
রঙের কুহেলি মেলে'।
গেঁয়ো নদীটীর দু'টী কূল ধরি'
ঝাউ-ঝাড়ে কেশ নাড়ে বিভাবরী.
জলের আঙিয়া উঠিয়াছে ভরি'
তারি ছায়া বুকে ফেলে'।

কেন তরী তুমি বেয়ে' যাও মাঝি
মোর নদী-তট দিয়া,—
তোমার গানে যে বাসা বাঁধিয়াছে
আমার গোপন হিয়া!
তুমি চ'লে যাবে সাঁঝেরি মতন
আঁধারে ভাসায়ে মেঘের আগুন,—
ঘিরিয়া আমার নয়ন-গগন
মেঘ দেছে ধারা ঢেলে;

ওগো ক্ষণিকের বন্ধু আমার,
ফিরে যাও তবে ঘরে;
এই ব্যথা শুধু রহিল, তোমায়
নারিনু রাখিতে ধ'রে!

মোর কেয়া-বনে ছিল যত ফুল
জলে ভাসালেম মিছে করি' ভুল,
এখন আমার বেড়িয়া দু'কূল
কাঁদন বেড়ায় খে'লে ॥

রাখালের রাজগী

রাখালের রাজা আমাদের ফেলি কোথা গেলে ভাই চ'লে,
বুক হ'তে খুলি সোণা লতা গুলি কেন গেলে পায়ে দ'লে।
জানিতেই যদি পথের কুসুম পথেই হইবে বাসি,
কেন তারে ভাই গলে প'রেছিলে এতখানি ভালবাসি?
আমাদের দিন কেটে যাবে যদি গলেতে কাজের ফাঁসি
কেন শিখাইলে ধেনু চরাইতে বাজায়ে বাঁশের বাঁশী?
খেলিবার মাঠ লাঙল বাজায়ে চষিতেই যদি হবে,
গাঁয়ের রাখাল ডাকিয়া সেথায় রাজা হ'লে কেন তবে?

তুমি চ'লে গেছ, শুধু কি আমরা তোমারি কাঙাল ভাই,
হারায়েছি গান গোচারণ মাঠ বাঁশের বাঁশরী তাই।
সোজাসুজি আজ উধাও চলিতে কোথা সে উধাও মাঠ,
গোখুর ধূলোর চাঁদোয়া-টাঙানো কোথা সে গাঁয়ের বাট?-
চরণ ফেলিতে চরণ চলে না শস্য-ক্ষেতের মানা,
খেলিবার মাঠে বড় জমকালো মিলেছে পাটের থানা।
গেঁয়ো শাখী আজ লুটায়ে পড়িছে কাঁচা পাকা ফল-ভারে,
তলে তলে তার মাঠের রাখাল হাট মিলাইতে নারে।
চষা মাঠে আজ লাঙল চলিতে জাগে না ভাটীর গান,
সারা দিন খেটে অন্ন কুড়াই, তবু তাতে অকুলান।
ধানের গোলার গর্ব্বেতে আজি ভরে না চাষীর বুক,
টিনের ঘরের আট-চালা বেঁধে রোদে জ্ব'লে পায় সুখ।

'বাছের নায়েতে' ছই দিয়ে চাষী পাটের বেপার করে,
'দাবড়ের' গরু হালের খেতেতে জোয়াল বহিয়া মরে।
হেমন্ত নদী ঢেউ খেলে নাক' 'শারীর' গানের সুরে
গরু-দৌড়ের মাঠখানি চাষী লাঙলেতে দেছে ফুঁড়ে।
মনে পড়ে ঘর ছোনের ছাউনি, বেড়িয়া চালের বাতা,
কৃষাণ-বধূর বুকখানি যেন লাউএর লতায় পাতা।
তারি পাশে পাশে প্রতি সন্ধ্যায় মাটীর প্রদীপ ধরি
কুমারী মেয়েরা আশিস্ মাগিত গ্রাম-দেবতারে স্মরি।
আজকে সেখানে জ্বলে না প্রদীপ বাজে না মাঠের গান,
ঘুম্‌লী রাতের প্রহর গণিয়া জাগে না বিরহী প্রাণ।
শুনো বাড়ীগুলো রয়েছে দাঁড়ায়ে, ফাটলে ফাটলে তার
বুনো লতাগুলো জড়ায়ে জড়ায়ে গেঁথেছে বিরহ-হার।

উকুন যাহার গায়ে মারা যায়—থন থন করে তাজা,
এমন গরুরে পালিয়া কৃষাণ নিজেরে বনে না রাজা!
ধানের গোলার গর্ব্ব ভুলেছে, ভুলেছে গায়ের বল,
চক্ষু বুঁজিয়া খুঁজিছে কোথায় টাকা বানানোর কল।
সারা দিন ভরি শুধু কাজ কাজ আরও চাই, আরও—আরও—
ক্ষুধিত মানুষ ছুটিছে উধাও, তৃষ্ণা মেটে না কারও।
পেটে নাই ভাত মুখে নাই হাসি, রোগে হাড়খানা সার,
প্রেত-পুরী যেন নামিয়া এসেছে বহিয়া নরক-দ্বার।

হাজার কৃষাণ কাঁদিছে অঝোরে কোথা তুমি মহারাজ?
ব্রজের আকাশ ফাড়িয়া ফাড়িয়া হাঁকিছে বিরহ-বাজ।
আমরা তোমারে রাজা ক'রেছিনু পাতার মুকুট গ'ড়ে,
ছিঁড়ে ফেলে তাহা মনির মুকুট পরিলে কেমন ক'রে?

বাঁশরী বাজায়ে শাসন ক'রেছ মানুষ পশুর দল,
সুর শুনে তার উজান বহিত কালো যমুনার জল।
কোন্ প্রাণে সেই বাঁশের বাঁশরী ভেঙে এলি গেঁয়ো বাটে ?
কার লোভে তুই রাজা হ'লি ভাই মথুরার রাজপাটে ?

বাঁশীর শাসন হেলায় স'য়েছি, বুনো ফলে দিছি কর,
অসির শাসন কি দিয়ে সহিব, বেচিয়াছি বাড়ী ঘর ;
হালের গরুরে নিলামে দিয়েও মিটাতে পারিনি ভুখ,
আধখানা ফলে পেট ভ'রে যেত—ভেবে ভেবে হয় তুখ ;—
এত পেয়ে তোর সাধ মেটে নাক, তুনিয়া জুড়িয়া ক্ষুধা,
আমরা রাখাল মাঠের কাঙাল যোগাইব তারি সুধা !
শোন রে কানাই স্পষ্ট কহিছি, সহিব না মোরা আর,
সীমার বাহিরে সীমা আছে যদি, ধৈর্য্যেরো আছে বা'র।
ভাবিয়াছ ওই অসির শাসনে মোরা হয়ে জড়সড়,
নিজের ক্ষুধার অন্ন আনিয়া চরণে করিব জড় ?

বাঁশীর শাসন মেনেছি বলিয়া অসিও মানিতে হবে !
গুরু দেয়া-ডাকে কাজরী গেয়েছি, ঝড়েও গাহিব তবে ?
বাঁশীর শাসন বুকে যেয়ে লাগে, নত হ'য়ে আসে শির,
অসির শাসনে মরাদেরো মাঝে জেগে ওঠে শত বীর।
ভাবিয়াছ মোরা গাঁয়ের রাখাল, নাই কোন হাতিয়ার,
যে লাঙল পারে মাটীরে ফাঁড়িতে, ভাঙিতেও পারে ঘাড়।

ঝড়ের সঙ্গে লড়িয়াছি মোরা, বাদলের সাথে যুঝি,
বর্ষার সাথে মিতালী পাতা'য়ে সোণা ধান করি পুঁজি।

*   *   *   *

তবুও সেখানে প্রদীপ জ্বালাই, ঘন আঁধারের কোলে,
আঁকড়িয়া আছি পল্লীর মাটী কোন্ ক্ষমতার বলে!
জনমিয়া যারা দুখের নদীতে শিখিয়াছে দিতে পাড়ী,
অসির শাসনও তরিবে তাহারা যা'ক না দু'দিন চারি।
পষ্ট করিয়া কহিছি কানাই এখনও সময় আছে,
গাঁয়ে ফিরে চল, নতুবা তোমায় কাঁদিতে হইবে পাছে।
জনম-দুখিনী পল্লী-যশোদা আশায় র'য়েছে বাঁচি,
পাতায় পাতায় লতায় লতায় লতিয়ে স্নেহের সাজি।
হিয়া খানি তার হানা-বাড়ী সম ফাটলে ফাটলে কাঁদি
বক্ষে ল'য়েছে তোমারি বিরহ বনের লতায় বাঁধি।

আঁধা পুকুরের পচা কালো জলে মূরছে কমল রাধা,
কৃষাণ বঁধূরা সিনান করিতে শুনে যায় তারি কাঁদা।
বেনুবনে তুমি কবে বেঁধেছিলে তোমার বাঁশের বাঁশী,
দখিনা বাতাস আজিও তাহারে বাজাইয়া যায় আসি!
কোমল লতায় দোলনা বাঁধিয়া শাখীরা ডাকিছে সুরে,
আর কত কাল ভুলে রবি ভাই পাষাণ মথুরা-পুরে?

আমরা ত ভাই ভেবে পাই নাক' তোর্ বা কেমন রীত,
একলা বসিয়া কেতাব লিখিস ভুলিয়া মাঠের গীত।

পুঁথিগুলো সব পোড়াইয়া ফ্যাল, দেখে গা'ও করে জ্বালা,
কেমনে কাটা'স সারা দিন তুই লইয়া ইহার পালা ?
ওরাই তো তোরে যাদু করিয়াছে, মোরা যদি হইতাম
ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া বানাইয়া ঘুঁড়ী আকাশে উড়াইতাম।
রাজধানী যে রে পরদেশ তোর—ইট কাঠ দিয়ে ঘেরা,
ইট কাঠে তাই আট ঘাট বেঁধে মনেও কি দিলি বেড়া ?

এত ডাক ডাকি শুনে না শুনিস, এমনি কঠিন হিয়া—
আমরা রাখাল ভাবিয়া না পাই—গলাইব কিবা দিয়া ?
একলা আমরা মাঠে মাঠে ফিরি পথে পথে কেঁদে মরি,
আমাদের গান শোনে না রে কেউ, লয় নাক' হাত ধরি।

* * * * *

* * * * *

চল গাঁয়ে যাই, আঁকা বাঁকা পথ ধূলার দোলায় দোলে,
দু'ধারের খেত কাড়াকাড়ি করে তাহারে লইতে কোলে।
কদম্ব-রেণু শিহরিয়া উঠে নতুন পাটল মেঘে
তমালের বনে বিরহী রাধার ব্যথা-দেয়া যায় ডেকে।

নিমন্ত্রণ

তুমি যাবে ভাই—যাবে মোর সাথে আমাদের ছোট গাঁয়,
গাছের ছায়ায় লতায় পাতায় উদাসী বনের বায় ;
মায়া মমতায় জড়া-জড়ি করি'
মোর গেহখানি রহিয়াছে ভরি',
মায়ের বুকেতে, বোনের আদরে, ভা'য়ের স্নেহের ছায়,
তুমি যাবে ভাই—যাবে মোর সাথে আমাদের ছোট গাঁয়।

ছোট গাঁওখানি—ছোট নদী চলে তারি এক পাশ দিয়া,
কালো জল তার মাজিয়াছে কেবা কাকের চক্ষু নিয়া।
ঘাটের কিনারে আছে বাঁধা তরী
পারের খবর টানাটানি করি'
বিনা সুতী মালা গাঁথিছে নিতুই এপার ওপার দিয়া
বাঁকা ফাঁদ পেতে টানিয়া আনিছে দুইটি তটের হিয়া।

তুমি যাবে ভাই—যাবে মোর সাথে ছোট সে কাজল গাঁয়,
গলাগলি ধরি কলাবন যেন ঘিরিয়া রয়েছে তায়।
সরু পথখানি সুতায় বাঁধিয়া
দূর পথিকেরে আনিছে টানিয়া,
বনের হাওয়ায়, গাছের ছায়ায়, ধরিয়া রাখিবে তায় ;
বুকখানি তার ভ'রে দেবে বুঝি মায়া আর মমতায়।

তুমি যাবে ভাই যাবে মোর সাথে—নরম ঘাসের পাতে,
চুম্বন রাখি' অধরখানিরে মেজে ল'য়ো নিরালাতে।
তেলাকুচ-লতা গলায় পরিয়া
মেঠো ফুলে নিও আঁচল ভরিয়া,
হেথায় সেথায় ভাব ক'র তুমি বুনো শাখীদের সাথে,
তোমার গায়ের রঙখানি তুমি দেখিবে তাদের পাতে।

তুমি যদি যাও আমাদের গাঁয়ে, তোমারে সঙ্গে করি
নদীর ওপারে চলে যাই তবে লইয়া ঘাটের তরী।
মাঠের যত না রাখাল ডাকিয়া
তব সনে দেই মিতালী করিয়া,
ঢেলা কুড়াইয়া গড়ি ইমারৎ সারা দিনমান ধরি,
সত্যিকারের নগর ভুলিয়া নকল নগর গড়ি।

তুমি যদি যাও—দেখিবে সেখানে মটর লতার সনে,
সীম—আর সীম—হাত বাড়া'লেই মুঠি ভরে সেই খনে।
তুমি যদি যাও সে-সব কুড়ায়ে
নাড়ার আগুনে পোড়ায়ে পোড়ায়ে,
খাব আর যত গেঁয়ো চাষীদের ডাকিয়া নিমন্ত্রণে
হাসিয়া হাসিয়া মুঠি মুঠি তাহা বিলাইব দুই জনে।

তুমি যদি যাও—শামুক কুড়া'য়ে খুব—খুব বড় ক'রে
এমন একটি গাঁথিব মালা যা দেখিনি কাহারো করে,
কারেও দেব না, তুমি যদি চাও
আচ্ছা না হয় দিয়ে দেব তাও,
মালাটিরে তুমি রাখিও কিন্তু শক্ত করিয়া ধ'রে,
ওপাড়ার সব দুষ্ট ছেলেরা নিতে পারে জোর ক'রে।

সন্ধ্যা হইলে ঘরে ফিরে যাব, মা যদি বকিতে চায়,
মতলব কিছু আটিব যাহাতে খুসী তারে করা যায়!
লাল আলোয়ানে ঘুটো কুড়াইয়া
বেঁধে নিয়ে যাব মাথায় করিয়া,
এত ঘুস পেয়ে যদি বা তাহার মন না উঠিতে চায়,
বলিব—কালকে মটরের শাক এনে দেব বহু তায়।

খুব ভোর ক'রে উঠিতে হইবে, সূয্যি উঠারও আগে,
কারেও ক'বি না, দেখিস্ পায়ের শব্দে কেহ না জাগে।
রেল সড়কের ছোট খাদ ভ'রে
ডানকিনে মাছ কিল্‌বিল্ করে;
কাদার বাঁধাল গাঁথি মাঝামাঝি জল সেঁচে আগে ভাগে
সব মাছগুলো কুড়া'য়ে আনিব কাহারো জানার আগে।

ভর দুপুরেতে এক রাশ কাদা আর এক রাশ মাছ
কাপড়ে জড়া'য়ে ফিরিয়া আসিব আপন বাড়ীর কাছ,
'ওরে মুখ-পোড়া ওরেরে বাঁদর!'
গালি-ভরা মা'র অমনি আদর
কতদিন আমি শুনিনারে ভাই, আমার মায়ের পাছ
যাবি তুই ভাই আমাদের গাঁয়ে যেথা ঘন কালো গাছ।

যাবি তুই ভাই, যাবি মোর সাথে আমাদের ছোট গাঁয়,
ঘন কালো বন—মায়া মমতায় বেঁধেছে বনের বায়।
গাছের ছায়ায় বনের লতায়
মোর শিশুকাল লুকায়েছে হায়।
আজিকে সে-সব সরা'য়ে সরা'য়ে খুঁজিয়া লইব তায়,
যাবি তুই ভাই, যাবি মোর সাথে আমাদের ছোট গাঁয়।

তোরে নিয়ে যাব আমাদের গাঁয়ে, ঘন-পল্লব তলে
লুকা'য়ে থাকিস, খুঁজে যেন কেহ পায়না কোনই বলে।
মেঠো কোন ফুল কুড়াইতে যেয়ে
হারাইয়া যা'স পথ নাহি পেয়ে,
অলস দেহটি মাটিতে বিছায়ে ঘুমা'স সন্ধ্যা হ'লে,
সারা গাঁও আমি খুঁজিয়া ফিরিব তোরি নাম ব'লে ব'লে।

যাব আমি তোমার দেশে

পল্লী-দুলাল, যাব আমি—যাব আমি তোমার দেশে,
আকাশ যাহার বনের শীষে দিক-হারা মাঠ চরণ ঘেঁসে।
দূর দেশিয়া মেঘ-ক'নেরা মাথায় লয়ে জলের ঝারি,
দাঁড়ায় যাহার কোলটি ঘেঁসে বিজলী-পেড়ে আঁচল নাড়ি।
বেতস কেয়ার বনে যেথায় ডাহুক মেয়ে আসর মাতায়,
পল্লী-দুলাল ভাই গো আমার, যাব আমি যাব সেথায়।

তোমার দেশে যাব আমি, দিঘল বাঁকা পন্থখানি,
ধান কাউনের খেতের ভেতর সরু সূতোর আঁচড় টানি ;
গিয়াছে সে হাবা মেয়ের এলো মাথার সিঁথীর মত
কোথাও সিধে কোথাও বাঁকা গরুর পায়ের রেখায় ক্ষত ;-
গাজন-তলির মাঠ পেরিয়ে শিমূলডাঙা বনের বায়ে ;
কোথাও গায়ে রোদ মাখিয়া ঘুম-ঘুমায়ে গাছের ছায়ে।

* * * * *

তাহার পরে মুঠি মুঠি ছড়িয়ে দিয়ে কদম-কলি,
কোথাও মেলে বনের লতা গ্রাম্যি মেয়ে যায় যে চলি।
সে পথ দিয়ে যাব আমি পল্লী-দুলাল তোমার দেশে,
নাম-না-জানা ফুলের সুবাস বাতাসেতে আস্‌বে ভেসে।

তোমার দেশে যাব আমি, পাড়ার যত দস্যি ছেলে,
তাদের সাথে দল বাঁধিয়া হেলায় সেথায় ফিরব খেলে।
ধল দিঘীতে সাঁতার কেটে আন্‌ব তুলে রক্ত-কমল
সাপলা লতায় জড়িয়ে চরণ ঢেউ-এর সাথে খাব যে দোল।
হিজল-ঝরা জলের সাথে গায়ের বসন রঙীন হবে,
দিঘীর জলে খেলবে লহর মোদের লীলা কালোৎসবে।

তোমার দেশে যাব আমি পল্লী-দুলাল ভাই গো সোনার,
সেথায় পথে ফেলতে চরণ লাগবে পরশ এই মাটি-মার!
ডাকব সেথা পাখীর ডাকে, ভাব করিব শাখীর সনে,
অজান ফুলের রূপ দেখিয়া মান্‌ব তারে বিয়ের কনে' ;
চ'লতে পথে ময়না কাঁটায় উত্তরীয় জড়িয়ে যাবে,
অঢেল মাটির হোঁচট লেগে আঁচল হ'তে ফুল ছড়াবে।

পল্লী-দুলাল, যাব আমি—যাব আমি তোমার দেশে,
তোমার কাঁধে হাত রাখিয়া ফির্‌ব মোরা উদাস বেশে।
বনের পাতার ফাঁকে ফাঁকে দেখব মোরা সাঁঝ-বাগানে,
ফুল ফুটেছে হাজার রঙের মেঘ-তুলিকার নিখুঁত টানে।

গাছের শাখা তুলিয়ে আমি পাড়ব সে ফুল মনের আশে,
উত্তরীয় ছড়িয়ে তুমি দাঁড়িয়ে থেকো বনের পাশে।

যে ঘাটেতে ভ'র্‌বে কলস গাঁয়ের বিভোল পল্লীবালা,
সেই ঘাটেরি এক ধারেতে আস্‌ব রেখে ফুলের মালা।
দিঘীর জলে ঘট বুড়া'তে পথে-পাওয়া মাল্যখানি
কুড়িয়ে নিয়ে ভাব্‌বে ইহা রাখিয়া গেছে কেই না জানি।
চেনে-না-তার হাতের মালা হয়ত সে-বা পরবে গলে,
আমরা দু'জন থাক্‌ব বসে ঢেউ-দোলা সেই দিঘীর কোলে।

চার পাশেতে বনের সারি এলিয়ে শাখার কুন্তল-ভার
দিঘীর জলে ঢেউ গণিবে ফুল শুঁকিবে পদ্ম-পাতার।
বনের মাঝে ডাক্‌বে ডাহুক, ফিরবে ঘুঘু আপন বাসে,
দিনের পিদীম ঢুলবে ঘুমে রাত-জাগা কোন্ ফুলের বাসে।
চার ধারেতে বন জুড়িয়া রাতের আঁধার বাঁধবে বেড়া,
সেই কুহেলীর কালো কারায় দিঘীর জলও পড়বে ঘেরা।
সেই আঁধারে পাখায় ধ'রে চামচিকারা উচ্চে উঠি,
দিকে এবং দিগন্তরে ছড়িয়ে দেবে মুঠি মুঠি।
তখন সেথা থাক্‌বে না কেউ, সুদূর বনের গহন কোণে,
কানাকুয়া ডাক্‌বে শুধু পহরের পর পহর গণে'।
সেই নিরালার বুকটি চিরে পল্লী দুলাল আমরা দু'জন
পল্লীমায়ের রূপটি যে কি, করব মোরা তার অন্বেষণ।

পলাতক

সে এক কিশোর ছেলে—
মোর আঙিনায় এসেছিল হেসে রাঙা পায়ে রেখা মেলে।
সাদা সাদা মেঘ রোদে ভেসে যায় শারদ গগন-গায়,
তারি পরে যেন অফুট উষসী সিঁদূর ছড়ায়ে যায়।—
এমনি মেঘের গুঁড়ো-করা ধূলি মাখা ছিল তার দেহে,—
সে দেহ পড়িছে এলায়ে এলায়ে মায়া মমতায় স্নেহে।

এলো মোর আঙিনায়—
হাসিখানি তার গোলাপী ঠোঁটের মালায় বাঁধিয়া যায়!—
সেই হাসি,—যারে কৌটায় ভরি' প্রথম রবির রেখা
পূবের গগনে উঁকি মেরে চায় মেঘে মেঘে আঁকি লেখা।
সেই হাসি, যাহা গোপন রয়েছে অফুট কুঁড়ির ঘরে,—
যে হাসি আজিও গড়া'য়ে পড়িছে চাঁদের কলস ভ'রে।
কবে সে আসিল আজ মনে নেই, কখন যে হাসে ফুল,
কখন যে জাগে সন্ধ্যার তারা কে জানে তা নির্ভুল।
প্রভাতেরে দেখি, কখন যে আসে সন্ধান নাহি জানি,—
তেমনি সে এলো মোর আঙিনায় রাঙা পায়ে রেখা টানি'।

আমার দেশের ধানের আঁচল যে হাওয়া দোলায়ে যায়,
সেই হাওয়া তারে ঘুম পাড়াইত স্বপন-পরীর গাঁয়।
পাখীরা তাহারে গান শুনাইত,—মেঘেরা আঁকিয়া ছবি
প্রভাতে ও সাঁঝে বানাইত তারে বিভোল কিশোর কবি।
গাছের পাতায় বাতাস ছুলিত, পেতে সে রহিত কান,
রাতে সে বসিয়া নিরালে শুনিত ঝিঁঝি পোকাদের গান।
ভাবিত সে বসি', ভাবিত সে তার কিশোর কালের মনে
মাটি যেন তার বুকের বেদনা ছড়াইছে তারি সনে।

রাত্রের আঙিনায়—
যত অপ্সরী নাচিয়া যাইত নূপুর জড়া'য়ে পায়।
তাহারা কখন কে নাচিবে এসে জানিত সে সন্ধান,
এরই মাঝে সে যে ভ'রে নিয়েছিল তাহার কিশোর প্রাণ।
অতীত তাহার বল্কল-ঘেরা কুহেলি-কুহর খুলে'
নিয়ে যেতো তারে স্বপন-জড়ান রূপকথা-রাজপুরে।
সে দূর দেশের অজানা রাজার কিশোর কুমার আসি'
তার সনে যেচে মিতালি করিত তারই মত মৃদু হাসি'।
হাসিয়া আসিত রাজার কুমারী কনক-মেঘের না'য়—
হাজার যুগের ঘুম-লেখা যার চোখে মুখে আর গায়।

আমার দেশের এই গাঁওখানি মাটির পাত্র ভরি,
লতারে সাজায়ে পাতারে সাজায়ে ফুলেরে প্রদীপ ধরি';
পাখীর গানেতে মন্ত্র পড়িয়া পূজা দিত তারে নিতি,—
কিশোর দেবতা সেই পূজাভারে মাখা'ত মনের প্রীতি।

ফিরিত সে মাঠে রাখালের সনে, বিকা'য়ে সোনার হার
সাপলা-লতার মালা লইবারে পরাণ কাঁদিত তার।
রাখালের সনে ভাব সে করিত, ঢেলার দালান গড়ি'
তাহাদের নিয়ে রাজা-রাজা খেলা করিত সে দিন ভরি'।

রাখাল ছেলেরা মনের হরষে শামুকের মালা গাঁথি'
কিশোর রাজার গলায় পরা'য়ে করিত খেলার সাথী ;
রাঙা মুখখানি রোদে পুড়ে যেতো, তাহারা ব্যাকুল হ'য়ে
সারা গায়ে তার বাতাস করিত কুমড়ার পাতা ল'য়ে।
কাশের পাতায় চরণ কাটিত, কাঁধের গামছা চিরে'
দুটি রাঙা পাও বেঁধে দিতে তারা ভাসিত নয়ন-নীরে।

তার পানে চেয়ে মাঠের চাষীরা ভুলিত খেতের কাজ,—
ভাবিত সে কোন্ সোনার দেবতা ধরায় এসেছে আজ!
তাহাদের মাঠে মাসে মাসে সাজে শস্যের আল্পনা,
আব্ছা-হলুদ লাল্চে-হলুদ হলুদে-জরদে-সোনা ;—
সাজে তৃণ-ভার ফুলে ও পত্রে গোলাপী-সবুজে মিশে',
আসমানী নীল মেঘলীয়া নীল তাহাতে হারায় দিশে।

সব রঙ যেন কাড়াকাড়ি করি' এ ওর হইতে বড়
বাতাসে হেলিয়া তৃণ এলাইয়া করিতেছে নড়নড়!
তবু কোন্ রঙ সব চেয়ে সেরা ভাবিবার আছে ধারা—
সে যেথা দাঁড়ায় সেথাকার রঙ সব চেয়ে লাগে বাড়া ;

উপরে আকাশ, নীচেতে অথই শস্তের পারাবার,
চার ধারে গাঁও ঘুরিয়া ঘুরিয়া বলয় হয়েছে তার।
মাঝখানে তারি দাঁড়া'য়ে হাসিত তরুণ কিশোর ছেলে—
দূর শূন্তের পথে উড়ে যেতো কনক-মেঘেরা খেলে।
সে দূর শূন্য কথা কয় নাক' মাঠেরও নাহিক ভাষা,
তাতে ফুল ফোটে বরণে বরণে পাতায় পাতিয়া বাসা ;—
সে যেন তাদেরি জীবন্ত ভাষা, তাহারই কথার সুরে
এ মূক মাঠের সকল কাহিনী ছন্দে ফিরিত ঘুরে'।
চাষীরা ভাবিত তাহাদেরি কোন ফসলের পথ বেয়ে
মাঠের দেবতা এসেছে বুঝিবা শস্তের গান গেয়ে !

ফিরিত সে রাতে জোৎস্নার রথে ছায়াপথ-মেঘ ধরি'
দেবতারা তার গায়েতে মাখা'ত তারকার ফুলঝুরি।
পূর্ণ চাঁদের গায়েতে জড়া'য়ে আবছা মেঘের দোলা,
অলস দেহটি আলসে এলায়ে ঘুমা'ত সে ঘুম-ভোলা।
রাতের শিশির চরণ ফেলিয়া তার চোখে আর মুখে
মণিমাণিকের খেলা জুড়ে দিত আপন মনের সুখে।
রাত-জাগা পাখী শুনাইত তারে ঘুম-পাড়ানিয়া গান,—
চাঁদেরে জড়ায়ে ঘুমায়ে হাসিত তাহার বদন-চান।

প্রভাত-মেঘের রাঙা পথ বেয়ে আসিত কিশোরী মেয়ে,
বন-বিহগীর অধরে অধরে ঘুম-ভাঙা গান গেয়ে।
গোলাপী ঠোঁটের চুমু এঁকে দিত তাহার সারাটি গায়,
রাঙা মুখ তার আরো রাঙা হ'ত রঙীন আলোর ঘায়।

ঘুম হ'তে সে যে জাগিয়া উঠিত, গায়ে নীহারের দাগ,
তাহাতে আবার ঢেউ খেলে গেছে নয়া প্রভাতের রাগ।

এমনি কিশোর-বেশে
এসেছিল সেই সোনার কুমার মোর আঙিনায় হেসে।
সেই একদিন,—ধূ-ধূ বালু ওড়ে জীবনের সাহারায়,
শিশিরের ফোঁটা ভেসে এসেছিল বিন্দু মেঘের গায়।
জীবনের এই অনন্ত ক্ষত সীমাহীন ক্রন্দন,
তার মাঝে কেবা ভালে এঁকেছিল এতটুকু চন্দন।
কে এই আকাশে দোলাইয়া গেল একটি রঙীন ঘুড়ি,—
কোন্ দুরাশার লিখন লিখিয়া পাখী চ'লে গেল উড়ি'।
কোন্ মায়ালোকে ছায়াপথ-পারে, আলোকের অলোকায়
কে আনিয়াছিল কি যাদুমন্ত্রে মোর আঙিনার ছায় ?

আজি যতদিকে যতবার চাহি, যেন দূর—কত দূর,
সে দূরেরো কোন্ দূর দুরাশায় মিশে গেছে সেই সুর।
আজি মনে হয়—শুধু মনে হয়—কতকাল—কতকাল—
কতকাল এসে কতকাল গেছে পাতি' বরষের জাল,
তারি এক-কালে এসেছিল সেই সোনার কিশোর ছেলে—
আর এক-কালে চলিয়া গিয়াছে মোর পূজাভার ফেলে।

আজি নগরের পাষাণ-কারায় কাঁদিছে বন্দী প্রাণ—
আর কি জীবনে পাবনাক' সেই কিশোরের সন্ধান ?

পাষাণ-প্রাচীর পাষাণে ঘিরেছে, কোনখানে নাহি ফাঁক,
পাষাণ-বক্ষ ভেদিয়া ইহার বাহিরে যায় না ডাক।
ডাকি উভরায়—সোনার কিশোর, ফিরে আয়, আয়, আয়,
সুর লেগে তার দিন-রজনীর খেয়া-নাও ভেসে যায়।

পাষাণের সাথে মাথা কুটে কাঁদি, নয়ন-নদীর জলে
যে গেছে চলিয়া সে যেন হায় রে আরও দূরে যায় চ'লে।
কে সেই কিশোর শুধাইছে সবে, বলিব কি আমি আজ ?—
পাষাণের দেশে কঙ্কাল-সার রুক্ষ ভিখারী-সাজ—
এই সে কিশোর! এ দেহের এই ভাঙা মন্দির-মাঝে
এসেছিল সেই সোনার কুমার নব জীবনের সাজে!

না রে, না রে, এ যে মিথ্যা প্রলাপ, অজান-গাঁয়ের ছেলে
পথ-ভুলে, ওরে শুধু পথ ভুলে এসেছিল হেসে-খেলে।
তারপর সে যে চলিয়া গিয়াছে আপন খেয়াল-ভরে,
কোথায় গিয়াছে কোন্ দূর দেশে, কে দেবে বলিয়া মোরে ?
হয়ত সে কোন শস্যের খেতে ঘুমা'য়ে রয়েছে আজ,
হিজলের বনে ছড়ায়ে তাহার গায়ের রঙীন সাজ,—
হয়ত সে কোন বেগানা-গাঁয়ের কৃষাণ ছেলের সনে
বেথুল কুড়া'য়ে ডুমকি বাজা'য়ে ফিরিছে বিজন বনে।

দিদারুল আলম স্মরণে

খেলা না ভাঙিতে খেলা ছেড়ে গেলি কার ডাক শুনে ভাই ?
এখনো যে তোর পূবালীর ঠোঁটে রঙ-লেখা মুছে নাই !
আজো এই মাঠে বাঁশের বাঁশীতে বাজে যে মাঠের গান,
কালিন্দী-জল আজো দুলে উঠে শুনিয়া তাহার তান।
তমাল-শাখায় আজিও জড়ায় কিশোরী মেয়ের শাড়ী,
মেঠো বাঁশী শুনে আজো ঢেউ খেলে কাঁখের কলসে তারি।
কারে অভিমান করিয়া বন্ধু ছেড়ি গেলি আমাদেরে,
এই ব্রজধামে আজো আসে নাই মথুরার দূত যে-রে।

কাঞ্চা বয়সে কে দিলরে তোরে আঙিয়ার শ্বেতবাস,
কোন্ দরবেশ তোর কাণে কাণে খুলিল মন্ত্রপাশ।
হায় মুসাফির, কে তোরে বাতা'ল গোরের কুহেলি পথ,
সেই একাকীয়া দূর দেশে তুই ছাড়িলি জীবন-রথ।
অভিমানী ছেলে, কারে চেয়েছিলি ? কারে তুই পা'স্ নাই ?
কোন্ নিদাঘের নিঃশ্বাসে তোর ফুল শুকাইল ভাই ?

ওরে বুলবুল, যারে শুনাইতে বেঁধেছিলি তুই গান,
সে ফুল-বনের কাঁটা দিয়ে কেউ বিঁধেছিল তোর প্রাণ ?
তাই ছেড়ে গেলি—হায় পলাতক, শূন্য পথের বাঁকে,
তোর গাঁথা গান আমাদের বুকে উভরিয়া আজ ডাকে।
আমাদের খেলা জমে না যে ভাই তোর সে আদর ছাড়া,
আজি মনে হয়, অমন করিয়া আদর জানে না কারা'।

একদিন মোরা ভুলে যাব তোরে, এ মায়ার দেশ পরে,
কেউ কারো স্মৃতি চিরদিন ভরি রাখিতে পারে না ধ'রে।
তোর দেশে ভাই হয়ত এমন মায়ার কুহক নাহি,
জীবনের গাঙে ঘটনার তরী যায় না এমন বাহি।
সেই দেশে তাই লিখে রাখিলাম আমাদের দিনগুলি,
এই খেলা-মাঠ, এই হাসি গান, সেথা নিয়ে যাব তুলি।
রোজ কেয়ামতে যদি দেখা হয়, তখন তোমারি বুকে
এদিনের কথা স্মরিয়া আমরা কাঁদিব মনের দুখে।

এই গাঁয়ে তুমি রহিও গো মেয়ে

এই গাঁয়ে তুমি ঘুমাইও মেয়ে, ফুল-কলিকার পাতে,
অলস দেহটি সোহাগে মেলিয়া স্বপন গাঁথিও রাতে।
বিদেশী বাতাস আঁচল নাড়িবে, অলক ছড়া'য়ে যাবে,
গায়েতে মাথিবে ফুলের সুবাস তুমি নাহি টের পাবে।
পহেলী উষার নয়া মেঘ ভাঙা সিঁদুর গুঁড়ার রাশি,
তোমার কোমল কমল-অধরে ছড়া'য়ে পড়িবে আসি।
তখন তুমিও মেলিও নয়ন, শিথিল বসনখানি,
ফুলের বাতাসে ধৌত করিয়া অঙ্গে লইও টানি।
নয়ন মুছিও পদ্মপাতায়, অঢেল কেয়ারে চিরে
রেণুগুলি তার সারাটি অঙ্গে মাখাইও ধীরে ধীরে।
উতলা পবন যদি বহে জোরে বাঁধিও না তবে চুল,
ও বদন-শশী অলকে ঢাকিলে হইও না নির্ভুল।

পথে যেতে যদি গাছের শাখায় আঁচল জড়া'তে চায়,
না হয় থামিও, সুদীর্ঘ দিন সমুখেতে দোল খায়।
যদি ডাকে পাখী 'বৌ কথা কও', তারে গাল নাহি দিও,
যদি পায়ে বাজে পায়ের নূপুর সে কথা কাণে না দিও।
অত শত ভাবা তোমারে কি সাজে, মিহি সুরে গান গেয়ে
তুমি চ'লে যেও আপনার মনে গেঁয়ো পথ খানি বেয়ে।

এই গাঁয়ে তুমি রহিও গো মেয়ে, এ গাঁয়ের তরুলতা
তোমার সারাটি অঙ্গে জড়াবে যার যত কোমলতা।
কচি সীম-লতা বাহুতে বাঁধিও, খোঁপায় দো-পাটি ফুল,
মাঠের কুসুম ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া পরিও কানের দুল।
নরম ডানার ডালায় ধরিয়া দূর আকাশের গান,
পাখীরা নিতুই আসিবে তোমার ভরিতে ফুলের প্রাণ।
এই পথ দিয়ে চলিবে যখন শাল বীথিকার ছায়,
মৃদু ফুলরেণু ঝরিয়া পড়িবে তোমার সারাটি গায়।

এই গাঁয়ে তুমি রহিও গো মেয়ে, গ্রাম দেবতার কাছে,
নীরবে কহিও ছোট মনে তব যত না বাসনা আছে।
দেউল তাহার যত না সাজিবে তব পূজা ফুল পেয়ে,
তোমার একটি প্রণামে সাজিবে শতগুণ তার চেয়ে।
রাতে গেঁয়ো ঘরে জ্বালাইও দীপ, ঘর-হারা পরবাসী
বন্ধুর পথে চলিতে চলিতে দেখিবে তাহার হাসি।

একা

কারে ল'য়ে আজ ঘরে ফিরে যাব
এই একা বালু চরে
উদাসী বাতাস ফিরিছে উড়াল—
ধূলার আঁচল ধ'রে।

তুমি যদি আজ দাঁড়া'তে আসিয়া
তব রাঙা মুখে রঙিন হাসিয়া,
সাঁঝের সিঁদূর নিতাম লুটিয়া
তোমার মুখেতে ধ'রে।

তুমি যদি আজ আসিতে এখানে,
দূরের উদাস ছায়া
তোমার তুইটি নয়নে মাখিয়া,
দেখিতাম তারি মায়া।

তোমার বাহুর সোণার সূতায়
বেঁধে রাখিতাম সাঁঝের ছায়ায়,
জল-লহরীর হেরিতাম দোলা
তোমার মাঝারে ধ'রে।

কারে আমি চাই

কারে আমি চাই, কার তরে আজি বারণ না মানে হিয়া,
কার তরে সখি ঘুমেরে না মানে নিদারুণ এ রাতিয়া!
এ জীবনে যারা কাছে এসেছিল, যারা এ গাঙের ধারে
আলোক-তরণী ক্ষণেক ভিড়া'য়ে চ'লে গেল পারাপারে,—
পাগল পরাণ মিছাই তাদের কূলের বাঁধন দিলি,
প্রতিদানে শুধু কূল-ভাঙা ব্যথা কোল ভরে সঞ্চিলি!
মোর ঘাটে এসে কবে ভিড়েছিল বিদেশী চাঁদের তরী,
মনে আশা ছিল, রেখে দেবো তা'রে কাঁখের কলসে ভরি'।
মাটীর কলস জলে ভ'রে গেলো, কালো সে নদীর জলে,
আধা গাঙ্‌খানি আলোকে ভাসা'য়ে চাঁদ হাসে কূতুহলে।

ভাবিয়াছিলাম, তাহারে বসা'য়ে আমার আঁখির ঘরে
কাজল-লতার বাঁধন বাঁধিয়া রাখিব হেথায় ধরে'।
সে আঁখি যে সখি পূর্ণ হইল আমার চোখের জলে;
কাজল-লতার বাঁধন টুটিল তারি কল-কল্লোলে!

আমার দুয়ারে এসেছিল তারা এসেছিল ফুল, পাখী,
এসেছিল আর ফিরে চ'লে গেলো মোর বুকে ব্যথা রাখি'।
কেন এলো তা'রা ? এলোই যদিবা, কেন চলে গেল, হায় !
কেন যারে-তারে হঠাৎ দেখিয়া এত ভালো লেগে যায় !
যারে ভাল লাগে, কি হয় তাহার মনের মতন হ'তে !
এ সব কথার উত্তর কেউ দিতে পারো কোনো মতে !

বামুন বাড়ির মেয়ে

বামুন বাড়ীর মেয়ে
কাঁচা রোদের বরণ ঝরে গা-খানি তার বেয়ে ;—
সে রোদ দেখা যায় যেমনি বনের পাতার ফাঁকে,
শিশু রবির টুক্‌রো আলো ছড়ায় ঝাঁকে ঝাঁকে ;
তেমনি তাহার বসন বেয়ে, আঁচলখানি বেয়ে
যে পথ দিয়ে চলে সে পথ রূপে যে যায় নেয়ে।

এই গাঁয়েতে আধলা পুকুর, পচা কাজল জল ;
বেঙের ছাতি তাহার বুকে ভাসছে অবিরল।
সেখানেতে পানার বহর বেঙের ছাতার সনে
চিরস্থায়ী ঘর বাঁধিয়া বাস করে নির্জ্জনে।
তারির ফাঁকে বরষ বরষ জল-কুমুদের পরী,
চাঁদের আলো মাথায় তাহার ফুলের কুটীর ভরি
সেই জলেরি ঢেউ বাঁধিয়া সূক্ষ্ম লতার সনে
কলমী কুসুম নিতুই সাজে নতুন বিয়ের ক'নে।
সেখানেতে পদ্ম পাতায় মেলিয়া পূজার ফুল,
কমলিনী পুকুর জলে ভাসায় জাতিকুল।

তেমনি এই সুদূর গাঁয়ে ম্যালেরিয়ার বাস,
ঝগড়া ফেসাদ কুসংস্কার ঘুরছে চারি পাশ।
এরির মধ্যে বাস করে এই বামুন বাড়ীর মেয়ে,
সবার সনে থেকেও সে যে একলা সবার চেয়ে।
ও যেন ঠিক কুমুদ কুসুম দীঘির পচা জল,
আজও তাহার পায়নি ছুঁতে পরাগ শতদল।
ও যেন ঠিক ঝুমকো লতা, জড়িয়ে গাঁয়ের সব,
হাসছে উহার পাতায় পাতায় ফুলেরি উৎসব।

এই গাঁয়েতে বরষ বরষ আসেন মহামারি,
হাজার পরাণ ধূলায় লোটে চরণ ঘায়ে তারি।
আসে হেথায় বসন্ত আর কলেরা প্লেগ আদি,
ওই মেয়েটির প্রতি এদের কেউ নাহি হয় বাদী।
সে যেন গাঁর পূজার কুসুম, সকল অত্যাচার,
সাহস নাহি পায় ছুঁইতে চরণ দুটি তার।

আছে গাঁয়ের নারদ পিসী ক্ষান্ত মাসীর মাতা,
যাহার যত গোপন কিছু লিখছে ভরি খাতা।
আছে গাঁয়ের মোক্ষদা: সে খ্যাংরামুখী বুড়ী;
মুখে কথার বজ্রশিলা ফিরছে ছুঁড়ি ছুঁড়ি।
ওই মেয়েটীর জগৎ যেন তাদের হ'তে আর;
কিম্বা তারা বুঝ্‌ছে যে ও নাগাল পাওয়ার বার

ওই মেয়েটীর চলন-চালন আর যে হাসি-খুসী,
কারো হাসি-খুসীর সনে হয়নি আজো তুষী।
এ গাঁয় প্রথম চাঁদ আসিয়া ব'সে শিমুল ডালে,
সোণা হাসির মুঠি মুঠি ছড়ায় উহার গালে।
সন্ধ্যা বেলায় যে রঙ্ ঝরে গাঁয়ের পুকুর জলে ;
সেও হয়ত ওরির পায়ে আল্‌তা মাখার ছলে।

গাঁয়ের মাঝে বামুন বাড়ী সকল বাড়ীর সেরা ;
চার ধারে তার নানান বরণ ফুল-বাগিচার বেড়া।
পাতায় পাতায় ফুলের বাসা, ফুলের স্বপন মাঝে,
ফুলের চেয়েও ফুলেল সাজে বামুন বাড়ী রাজে।

তাদের ঘরে ঠাকুর আছে মন্ত্র পড়ি রোজ
তুলসী তামা গঙ্গা জলে দেয় যে পূজার ভোজ।
সেথায় জ্বলে হোমের আগুন, ঘণ্টা কাঁসর বাজে,
তাহার মাঝে বামুন বাড়ীর পূজার ঠাকুর রাজে।

বামুন পাড়ার স্বপন যেন ধূপের ধোঁয়ায় হেসে,
পূজারতির মন্ত্র সনে বেড়ায় ভেসে ভেসে।
তারি পরে দাঁড়িয়ে যেন বামুন বাড়ীর মেয়ে,
হোমাগুনের গন্ধ ঝরে সারাটি গাও বেয়ে।

আজি পুষ্পের জনমের তিথি

আজি পুষ্পের জনমের তিথি, শিশির ঘুমা'য়ে রয়,—
ঘুমা'য়ে ঘুমা'য়ে স্বপনের ঘোরে চাঁদ সনে কথা কয়।
ভোরের বাতাস পাতায় পাতায় সাবধানে পদ রাখি',
চলিছে উদাস অফুট কুঁড়িরে মিহি সুরে ডাকি ডাকি।
অতি সাবধানে চ'লেছে সে পথে, যেন তারি পদ ঘায়
নীহারের লেখা নাহি মুছে যায় পাতার কোমল গায়।
যেন না জাগিতে ভোরের কুসুম পাখীরা না ওঠে জাগি,'
চলেছে বাতাস—ভোরের বাতাস সাবধানে তারি লাগি'।

আজি পুষ্পের জনমের তিথি, চাঁদ চলিয়াছে রথে,-
দূর গগনের মায়া মেঘময় ছায়াপথ-ঘেরা পথে।
আসে নববধূ বরণ ডালায় সিঁদূর কৌটা ধরি',
চরণে চরণে গগন-পথেরে দলিয়া রঙীন করি'।

আবীর-সাগরে দিক হারাইল শুক তারকার তরী,
আলোক-কুমার ছোঁড়ে বাঁকা তীর আধেক ধরণী ভরি।
শুক বঁধু তার সারীরে ডাকিছে, কুসুমের আগমনী
আকাশে বাতাসে ছড়া'তে হইবে দিয়ে কণ্ঠের ধ্বনি।
আজি পুষ্পের জনমের তিথি, ভোরের পুবাল বায়
অফুট রবির কিরণ ফুটিছে অফুট কুঁড়ির গায়।
জাগে বন পথে কানন-কুমারী ফুলের কৌটা খুলি',
বাতাসে বাতাসে ছড়াইয়া দিছে গন্ধের মিহি ধূলি।
বন-অপ্সরী খেলিতেছে দোল কাননের শাখে শাখে,
বরণে বরণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া গায়েতে গন্ধ মাখে।

পুরাণ পুকুর

পুরাণ পুকুর, তব তীরে বসি কত কথা ভাবি সই,
খেজুরের গোড়ে বাঁধা ছোট ঘাট, করে জল থই থই ;
রাত না পোহা'তে গাঁয়ের বধূরা কলসীর কলরবে,
ঘুম হ'তে তোমা জাগাইয়া দিত প্রভাতের উৎসবে।
সারাদিন ধরি ঘড়ায় ঘড়ায় তোমার অমৃতরাশি,
বধূদের কাঁখে ঢলিয়া ঢলিয়া ঘরে ঘরে যেত হাসি।
'বদনায়' ভরা এতটুকু, তারি ভরসায় গেঁয়ো-চাষী,
চৈত্র-রোদেরে করুণ করিয়া বাজা'ত গানের বাঁশি।
মাঠ হ'তে তারা জ্বলিয়া পুড়িয়া আসিত তোমার তীরে,
খেজুর পাতায় সোনালি চামর দোলা'তে তাদের শিরে।
শান্ত হইয়া গামছা ভিজা'য়ে তোমার কাজল-জলে,
নাহিয়া নাহিয়া সাধ মিটিতনা—আবার নাহিবে ব'লে।

এইখানে বসি পল্লী-বধূরা আধেক ঘোমটা খুলি,
তোমার মুকুরে মুখখানি হেরে জল-ভরা যেত ভুলি।
সখিতে সখিতে কাঁধে কাঁধ ধরি খেলিত যে জল-খেলা,
সারাটী গাঁয়ের যত রূপ আছে তব বুকে হ'ত মেলা।

পুকুরের জল 'উথলি পাথালি' ভাসিত তাদের হাসি,—
ফুলে ফুল লাগি ফুলেরা যেমন ভেঙ্গে হয় রাশি রাশি।
আজি মনে পড়ে পুরাণ পুকুর, মায়ের আঁচল ধ'রে
একটি ছেলের ঝাঁপা-ঝ"াপি খেলা তোমার বুকের পরে।
ওই এত জলে সাঁপ্‌লার ফুল,—তারি ছিল এত লোভ,
তাই তুলিবারে জলে ডুবিলেও মনে নাহি ছিল ক্ষোভ!
আজিকে তোমার কোথায় সে জল? কোথা সেই বাঁধা ঘাট।
গেঁয়ো বধূদের খাড়ূতে মুখর কোথা সে পুকুর বাঁট?

চারি ধারে তব বন-জঙ্গল পাতায় পাতায় ঢাকা,
নিকষ-রাতের আঁধার যেন গো তুলিতে র'য়েছে আঁকা!
ডুকরিয়া কাঁদে ডাহুক ডাহুকী তরু-মর্ম্মর-স্বনে,
তারি সাথে বুঝি উঠিছে শিহরি যত ব্যথা তব মনে!
হিজল গাছের মালা হ'তে আজি খসিয়া রঙিন ফুল,
সাঁঝের মতন দিতেছে ব্যথিয়া তোমার চরণ মূল।
সন্ধ্যা-সকালে আসিত যাহারা কলসী লইয়া ঘাটে,
তারা সবে আজি বিদায় নিয়েছে মরণ-পারের হাটে।
বক্ষ-মুকুরে সোনা মুখখানি দেখিবারে কেহ নাই,
কচুরী-পানায় আধ বুক খানি ঢাকিয়া রেখেছ তাই।

ঘুচাও ঘুচাও মৌন তড়াগ, বুকের আরসী খানি,
মোর বাল্যের যত ভুলো কথা সারা গায়ে দাও টানি।
সেই ছেলেবেলা স্বপ্নের মত কত স্নেহ-ভরা মুখ
এনে দাও, শুধু বারেক দেখিয়া ভ'রে লই সারা বুক।

এনে দাও সেই তব তীরে বসি মেঠো রাখালের বাঁশী,
স্বপনের ভেলা দুলা'য়ে দুলা'য়ে আকাশেতে যাক্ ভাসি'।
হায়রে, সেদিন আসেনা ফিরিয়া! শুধু ভিজে আঁখি পাতা,
পুরানো স্বপন কুড়া'য়ে কুড়া'য়ে আকাশেতে জাল পাতা!
তুমিও স্বজনী আমারি মতন না জানি কাঁদিছ কত,
ছোট ঢেউ গুলি নাড়িয়া নাড়িয়া পাড়েরে করিছ ক্ষত।
বনদেবী আজ সমবেদনায় আঁচল বিছা'য়ে জলে,
ব্যথাতুরা তব সারা বুক খানি ঢেকেছ কলমী দলে।

চৌধুরীদের রথ

চৌধুরীদের রথ—
ডান ধারে তার ধূলায় ধূসর তালমা হাটের পথ।
চামচিকে আর আরশুলারা নির্ভাবনায় বসি,
করছে নানান কল-কোলাহল রথের মাঝে পশি!
বাদুড় সেথা ঝুলছে সুখে, বাহির জগৎখানি,
অনেক দিনই ত্যাগ ক'রেছে তাদের জানাজানি।
গড়ুর বীরের মাথায় বসি পাঁকুড় গাছের চারা,
মেলছে শিকড়, তবু ঠাকুর দেয়নি কোন সাড়া।
কাঠের ঘোড়ার ঠ্যাং ভেঙ্গেছে, খস্‌ছে রথের ছাদ,
আজো তবু কেউ করেনি ইহার প্রতিবাদ।

রাস্তা দিয়ে নানান রকম লোকের চলাচল;
নানান রকম আলাপ-বিলাপ, নানান কোলাহল।
কেউ বা চাষী, কেউ বা ধনী, পরদেশী, কেউ দেশী,
ভাবে তারা সবার চেয়ে কাজের কথাই বেশী।
কেউ বা ভাবে মকর্দ্দমায় হারিয়ে দিয়ে কার
বসত-বাড়ী করবে নিলাম বাঁশ-গাড়ীতে তার।

কেউ বা ভাবে, কি কৌশলে মেলি কথার জাল,
এক-আনিতে আন্‌বে টেনে ছ'পয়সার মাল।
যতই কেন ব্যস্ত থাকুক, যতই কাজের তাড়া ;
হেথায় এলে সব ভুলে চায় রথের পানে তারা।

চাক-ভাঙা আর বয়স-মলিন চৌধুরীদের রথ,
তাদের পানে করুণ চেয়ে সুধায় যেন পথ ;—
সুধায় যেন, সেই অতীতের চৌধুরীদের কে,
ছুতোর ডেকে রঙিণ এ রথ গড়্‌ল পুলকে।
আস্‌ল গাঁয়ের বৃদ্ধ প'টো, রঙিণ তুলির সনে,
রেখায় রেখায় বাঁধল সে কোন্ সোনার স্বপনে।
রথের চূড়ায় উড়ল ধ্বজা, গাঁয়ের ছেলে-মেয়ে,
চলতে পথে থাকত খানিক রথের পানে চেয়ে।

*   *   *   *   *

তার পরে সেই রথের দিনে, হাজার লোকের মেলা
দোকান-পসার, ভোজবাজী আর ভানুমতীর খেলা ;
আস্‌ত গাঁয়ের বৌ-ঝিরা সব, আস্‌ত ছেলে-মেয়ে,
রঙিণ হাসির দুল্‌ত লহর রঙিণ কাপড় ছেয়ে।
বুড়ো মাসীর স্কন্ধে উঠে ছোট্ট শিশু ছেলে ;
এই রথেরি ঠাকুরটিরে দেখত আঁখি মেলে।
গাঁর বধূরা ভালের সিঁদূর মেলে পথের পরে,
সরল বুকের আঁক্‌ত পূজা এই ঠাকুরের তরে।

আঁচল তাদের জড়িয়ে ধ'রে ছোট শিশুর দল,
তালের পাতায় বাজিয়ে বাঁশী করত কোলাহল।
দৌড়ের নাও ভাস্‌ত গাঙে, রঙিন নিশান লয়ে,
গলুই ভরি জ্বলত পিতল নব-রতণ হয়ে।
তাহার গলে পরিয়ে দিত রঙিন সোলার-মালা,
এমনি মত হাজার নায়ে গাঙটি হ'ত আলা।
সেই নায়েতে বাছ খেলা'ত গাঁয়ের যত চাষী ;
বৈঠা পরে বৈঠা হাঁকি চ'লত তারা ভাসি।
তারি তালে গাইত তারা ভাটির সুরে গান,
শুনে নদী উথল-পাথল, ঢেউ ভেঙে খান খান।
কৌতূহলী দাঁড়িয়ে তীরে হাজার নর-নারী,
হাতে তাদের ছুল্‌ত মালা গলায় দিতে তারি ;—
যাহার তরী সব তরীরে পেরিয়ে যাবে আগে,
তারে তারা করবে বরণ মনের অনুরাগে।

সে-সব আজি কোথায় গেল, চৌধুরীদের রথ,
আজো যেন শুধায় সবে তাদের চলা-পথ।
চাকাগুলো ভেঙেছে তার, উই ধরেছে কাঠে,
কোন্ অভিযোগ বক্ষে লয়ে সময় তাহার কাটে।
ছবিগুলো যাচ্ছে মুছে, ভাঙা কদম ডাল,
ত্যাগ করিয়া পালিয়ে গেছে নিঠুর বংশীয়াল।
তলায় বসে একলা রাধা কাঁপ্‌ছে পুলকে,
জানতে আজো পায়নি তাহার বন্ধু নিল কে।
মাঠের পথে চলছে ধেনু বিরাম নাহি হায়,
রাখাল কবে পাও ভেঙেছে, কেউ না ফিরে চায়।

দল বাঁধিয়া চল্‌ছে কোথাও গাঁয়ের ছেলে-মেয়ে,
মৃদঙ্গ আর ঢোল বাজায়ে, বাঁশীতে গান গেয়ে।
হয়ত কোন পরব গাঁয়ের করবে সমাপন,
হাজার বরষ আগেই তাহার করছে আয়োজন।
কারো কাঁধের ঢোল ভেঙেছে, কাহারো একতারা,
দল-পতি যে নেইক সাথে টের পায়নি তারা।

এমনি কালের কঠোর ঘায়ে দিনের পরে দিন,
এ সব ছবির একখানিরও থাকবে নাক চিন।
এর সাথে সেই গাঁয়ের পোটো,—তাহার কথাও সবে,
ভুলে যাবে অজানা কোন্ দিনের মহোৎসবে।
কোন্ সে অতীত আঁধার সাগর, তাহার পারে বসি,
এঁকেছিল সোণার স্বপন বরণ ঘষি ঘষি।
হয়ত তারি গাঁয়ের যত নর নারীর দল,
মনে তাহার ফুটিয়েছিল স্বপন শতদল;
তারি একটি সোণার কলি আলোক-তরীর প্রায়,
সপ্ত সাগর পার হইয়া ভিড়ছে রথের গায়।
আজ হয়ত অনাদরেই অনেক অভিমানে,
চলছে ফিরে প্রদীপ-তরী সেই অতীতের পানে,
সেখানে সেই বৃদ্ধ পোটো বনস্পতির প্রায়,
হাজার শাখা এলিয়ে বায়ে ঢুলছে নিরালায়।
চাক-ভাঙা আর বয়স-মলিন চৌধুরীদের রথ,
আজো যেন চক্ষু মুদে খুঁজছে তাদের পথ।
বনের লতায় গা ছেয়েছে, গাছের শাখা তারে,
জড়িয়ে ধরে এ সব কথা শুনছে বারে বারে।

তুমি আমাদের কবি

তুমি আমাদের কবি,
খুব বড় কবি হয়ত তুমি বা, যতটা বড়রে
ধারণা করিতে পারিনে আমরা সবি।
আকাশের তারা, আকাশের চাঁদ, যতটা উঁচুতে
আমরা কি কেউ সেথায় যাইতে পারি ?
কত দূরে আছে—আমাদের কেউ তত দূর পথ
দেয়নিক কভু পাড়ী।

আমরা আকাশে ঘুড়ী উড়াইয়া সূতো ছেড়ে দেই,
উঁচু হ'তে আরো উঁচুতে সে ধায় ;
—আরো দূরে যায় ; তারপর যবে
লাটা'য়ের সূতো সব হয়ে যায় শেষ,
তখনো সে ঘুড়ী ছুঁইতে পারে না যতটা উঁচুতে
তারা ও চাঁদের দেশ।

বালুচর হ'তে পাখী উড়ে যায়
লাল-নীল-সাদা নানান রঙের পাখী,
বালুর চরের কৃষাণী মেয়ের খুব ধ'রে ধ'রে সরু হাতে আঁকা
ছবিগুলো যেন পাখার উপরে রাখি।

বহু দূরে যায়, আকাশের মেঘ—শীতের কুয়াসা,
তাও ছাড়াইয়া চ'লে যায় তারা দূরে ;
শূন্যের পথে যত মিঠে গান ছড়া'তে ছড়া'তে উড়ে যায় তারা,
তবু নাহি পারে পরশ করিতে চাঁদ ও তারার পুরে।
আমাদের কাছে আকাশের তারা ছোট ছোট ফুল,
ছোট ছোট যেন দীপ ;
অত দূরে চাঁদ, তবু তা'রে ল'য়ে পরি যে আমরা
কপালে চাঁদের টীপ।

খুব বড় কবি হয়ত তুমি বা, আকাশের তারা আকাশের চাঁদ
হয়ত তুমি বা তাদেরই আপন কেহ ;
যতটা দূরেরে আমরা কেহই ধারণা করিনে
ততটা দূরেই হয়ত তোমার গেহ।
হয়ত চাঁদের খাটেতে ঘুমাও, শিশু তারাগুলি
তোমার সারাটি গায় ;
মণি-মাণিকের চূর্ণ ছড়া'য়ে খেলা করে তারা উড়াল পূবাল বায়।
হয়ত পাখীর পাখায় রঙিণ সোনার তরণী ভাসাইয়া নীল জলে ;
মনের খেয়ালে গান গেয়ে যাও—যত দূর খুসী
তত দূরে যাও চ'লে।
এসব আমরা পারিনে বুঝিতে ভুল ক'রে তাই আমাদের মাঝে
তোমারে ডাকিয়া আনি,
তুমি যেন কবি আমাদেরি কেহ মাঝে মাঝে তাই
তোমারে লইয়া করি মোরা টানাটানি।

তুমি কথা কও বাতাসের সনে আকাশের সনে
আর মেঘেদের সনে ;
দিগন্ত পথে রামধনু সাজে সাতনরি হারে
তোমার বিয়ের ক'নে।
আলোর দেশের কচি শিশু তুমি ! ছায়া সনে খেলা করি
যেন কোথা যাও ওগো পথ-ভোলা
দিন-রজনীর দুইখানি পাখা ধরি।

আমরা কি এর বুঝি অত শত
আমরা মাটীর জীব,
মাটীর ঘরেতে খেলা করি মোরা
গড়িয়া মাটীর শিব।
তেমনি তোমারে ডাকিয়া আমরা যে কথা কহিব
সে সব কথা ত তোমার যোগ্য নয়,
কথার দেশেতে রাজ্য গড়িয়া কথার মাণিক ল'য়ে যে খেলায়
তার মত কথা কোথাও যে নাহি হয়।

তবু তুমি কবি—আমাদের কবি
আর আমাদের কথা,
—সে যে আমাদেরি—সেই গৌরবে তাই দিয়ে আজ
তোমার গলায় পরাই স্নেহের লতা।
তুমি আস নাই—এমন দিনেতে
আমাদের গেহে আসিত আলো ও ছায়া,
আসিত আকাশ, আসিত বাতাস, সেদিনও তাহারা
গায়ে মাখে নাই তোমার চোখের মায়া।

আকাশে আসিত নব নব মেঘ তড়িৎ-লেখায়
লিখিয়া কণক চিঠি,
দূর একাকীয়া শূন্যের পথে খুঁজিত মোদের দিঠি ;
সেদিন আমরা চিনিনি তাদের,
আমাদের যেন বুঝিবার অগোচরে ;
সমবেদনায়, স্নেহ ও মায়ায় আমাদের বুক
দিয়ে যেত তারা ভ'রে।

যুগের উপরে যুগ কেটে গেছে, শরৎ এসেছে
শেফালী ফুলেতে ভরিয়া আঁচলখানি ;
দিঘী-তড়াগের কাক-চোখ জলে সাপলার ফুলে
রেখেছে চরণখানি।
বর্ষা এসেছে কেতকী পাতায় সাজায়ে ফুলের তরী,
ঘন বন-ছায়ে নীপ কেশরের অফুট বেদনা স্মরি ;
আমরা ঘরের কপাট আঁটিয়া কত ফাঁক তার
বন্ধ করিতে ছিলাম ব্যস্ত যবে,
তারি একদিনে তুমি এলে কবি
ফুল ফোটানর দোলানর উৎসবে।

সেদিন হইতে দুয়ার খুলিল, দিগন্ত-ঘেরা বাহিরের ওই
সুনীল আকাশখানি ;
তোমার গানের সুরের সূতায়
আমাদের ঘরে আনিলাম তারে টানি।

বর্ষারে মোরা বন্ধু পাইনু বাদল রাতের
মেঘেতে মেলিয়া বুক,
কতবার মোরা খুলিয়া খুলিয়া দেখেছি মনের দুখ।
শরতের মেঘে পাল তুলে দিয়ে
সিঁদূর কুড়া'য়ে ছুটেছি সাঁঝের দেশে,
দখিন হাওয়ায় দোলা দিয়ে মোরা
ফুল বিছায়েছি বন-রূপসীর কেশে।
সেদিন হইতে আকাশ হইল মোদের বসত বাড়ী,
ছয় ঋতু এসে বরণ ছড়ায় নাচিয়া নূপুর নাড়ি'।
তুমি এসে কবি গান ছেড়ে দিলে, সে গানের সুরে
মানিলাম বিস্ময়,
আমাদের যত ছোট সুখ-দুখ তব ছোঁয়া পেয়ে
তাহাও এমন হয়!

দারা-সুত আর পরিজন লয়ে ভবের মঞ্চে
নাচিয়া কুঁদিয়া কাঁদিয়া যাহারা ক'রে দিত একাকার,
তাহাদের মাঝে খুলে দিলে তুমি স্বর্গের এক দ্বার।
আমাদের গেহে আসে মায়াপরী নবীন শিশুর বেশে,
যেথায় যাহারে যত ভালবাসি, সেই ভালবাসা
অলকায় যায় ভেসে।
এত বড় আর এত ছোট কথা কোথা পেলে তুমি
কোন্ সে যাদুর বলে,
আমাদের তুমি এত ভাল করে
দেখা'তে পারিলে ছন্দের শতদলে।

সুরের দুলাল, চলিয়াছ তুমি আপনার মনে গাহি',
দূর বন্ধুর তব সুর-পথ বড় একাকীয়া
সেথায় তোমার হয়ত দোসর নাহি।
অজানা পথিক গ্রহের মতন চলেছ কক্ষ-পথে,
দেশ হ'তে দেশে টানে মহাকাল রজ্জু বাঁধিয়া
তোমার কণক রথে।
আমাদের মত কত দেশে তুমি
রাখিয়া এসেছ গানের চরণ চিন্,
হয়ত আরো বা কত দেশে যাবে
বাজা'তে বাজা'তে তোমার মরম-বীণ।
তব চলা পথ দূর—বহু দূর—
সীমা নাহি শেষ নাহি,
যত চল তুমি তত তৃষা বাড়ে
দূরন্ত যেন কাঁদিছে তোমারে চাহি।
সেই চলা-পথে চলিতে চলিতে হয়ত পথের ভুলে,
আমাদের গ্রহে খনেক দাঁড়ায়ে দু'হাতে ছড়ালে
কথায় কথার ফুলে।

হে সুর-বিহগ, খনেক দাঁড়াও, বারেক ফিরিয়া
চাহ আমাদের পানে
হের তব সুর নদী বেয়ে আজ অলকানন্দা
ছুটেছে বিপুল বানে।

দিনেরে লুকা'য়ে রাতেরে লুকা'য়ে রঙিণ ঠোঁটের সূতায় গাঁথিয়া,
যে কথার মালা বধূরা মোদের পরাইয়া দেয় গলে!

তুমি ত জান না তব গান হ'তে সেই সব কথা,
খুব চুপি-চুপি কখন এসেছে চ'লে।
লাজুক বধূর সিঁদূর কৌটা ভরিয়া গিয়াছে
কানে-কানে শোনা যে কথার লয়ে পুঁজি,
তোমার ঘরে যে সিঁদ কেটে মোরা
সেই সব কথা চুরি করিয়াছি
এ সব কি তুমি দেখিয়াছ কভু খুঁজি?
আমাদের সুখে আমাদের দুখে ব্যথার জোঁয়ার জলে,
—তুমি জান কবি—সেই পথ দিয়ে
তোমার সুরের খেয়া-তরীখানি চলে।

দুঃখের রাতে কত যে কেঁদেছি
তোমার গানের সুরে সুরে বুক ফাঁড়ি,
শিয়রে প্রদীপ নিবিয়াছে তবু
তুমি যাও নাই ছাড়ি।
দরদী বন্ধু! জানি মোরা জানি তুমি বড় কবি
যতটা বড়রে ধারণা করিতে পারিনে আমরা কেহ,
তোমারে বলিতে আপনার জন সমান বয়সী
আজি উথলিছে সকল বুকের স্নেহ।
তুমি আমাদের, তোমার দুয়ারে
মাটীর প্রদীপ রাখি,
আজি সাধ যায় সব বুক ভরি
তোমারে আমরা আমাদের বলি ডাকি।

হে দূর বিহগ, জানি মোরা জানি
তোমারে ডাকিছে তৃষ্ণার মায়াপরী,
তুমি একদিন আমাদের গ্রহ ছেড়ে চলে যাবে
আর গ্রহপথ ধরি।
তবু এই গ্রহে তোমারে আমরা বাঁচা'য়ে রাখিব
বহু বহু কাল ধ'রে,
তব গানগুলি অনাগত যুগে
দিয়ে যাব মোরা মোদের বংশধরে।
আর ব'লে যাব এ গানের জালে আমাদের কাল
ঘিরিয়া সুরের সনে,
যুগ হতে যুগে পাঠাইছে বসি
এক কবি নির্জ্জনে।
তারি হাতে লেখা মোদের কালের
রঙিণ এ চিঠি পাছে
নিজে মহাকাল পড়িয়া শুনাবে
না-আসা যুগের ভাই-বোনেদের কাছে।
প্রদীপ-তরণী ভাসিয়া চলিল
আজিকার নদী জলে
কাল হ'তে কালে যুগ হ'তে যুগে
আমরাও যাব এরি সাথে সাথে চ'লে।

ফুপুমার কবরে

এইখানে সেই ছোট মেয়েটীরে দিয়েছিল তারা বিয়ে,
জীবন প্রভাতে ব্যাথার মুকুট মাথায় পরায়ে দিয়ে।
শুনো পথপানে চাহিয়া থাকিত আসে যদি বাপ ভাই,
গেঁয়ো পথিকেরা পথ দিয়ে গেলে চমকি উঠিত তাই।
ভিখারীরে দিয়ে দুই মুঠো চাল কয়ে দিত কানে কানে,
"মায়ের আগেতে খবর কহিও বড় ব্যথা মোর জানে।
'ডালিম-'গাইছা' বাড়ী আমাদের, পূর্ব্ব-দুয়ারী ঘর',
কলার পাতারা দোলায় চামর তাহার মাথার পর।
কাল রাত্তিরে স্বপন দেখেছি রোগে ভুগিতেছে মা—
তালতলী গাঁয়ে দেখে আয় তারে, ভিখারীরে তুই যা।"

স্বামী ছিল তার বদ্ধ পাগল, এ পাড়া ও পাড়া ফিরি,
গল্প করিয়া সময় কাটাত না ছিল কাজের ছিরি।
রাগাইলে তারে নিস্তার নাই রক্ত-চক্ষু করি,
হাঁক ডাকে তার এক নিমিষেই সারা গ্রাম যেত ভরি
এমনি স্বামীরে লইয়া তবুও বেঁধেছিল সুখ-হার,
রাজার কুমার ছেলে হয়েছিল মেয়ে গুটী তিন চার।
পঁচা পুকুরের ঘোলা জলে নেয়ে মাটীর কলস খানি,
পদ্মের বনে ঢেউদিয়ে যবে কক্ষে লইত টানি,
জল-কমলের সঙ্গে যে হ'ত থল-কমলের দেখা
জলের লক্ষ্মী হাসিত যে তাহা স্থল-লক্ষ্মীরো শেখা।

পঙ্করাণীরে কেউ দেখিত না দেখিত যদি গো কেহ,
বেণু লতাগুলি সোহাগে জড়ায় তাহার পাতার গেহ,
তারিতলে জ্বলে মেটো দীপখানি মশা ওড়ে দলে দলে,
সমুখে ঘুমায় গেহের লক্ষ্মী হাতে মুখে ফুল জ্বলে ;—
এপাশে ছেলেটী, ওপাশে মেয়েরা যেন খোদা বহুরূপী,
বিরলে লিখিয়া ভেস্তের ছবি দেখিতেন চুপি চুপি।
হায় মহাকাল কঠোর কৃপাণ কঠিণ চরণ ঘায়,
দলিয়াছ সেই সোণা মন্দির পথের ধূলার গায়।
সেকি তা জানিত, ছেলে-ধরা কোন মৃত্যু-ধূসর বুড়ী
একে একে তার বাছাগুলি হায় নিয়ে যাবে করি চুরি।

আমরা তাহারে দেখেছি যখন জীর্ণ শীর্ণ দেহ
গেঁয়ো লক্ষ্মীর ভাঙ্গাবুক ঢাকে ভেঙ্গে-পড়া কুঁড়ে গেহ।
ছেলের মেয়ের শোকে তাপে তার আন-জীবনের ভার,
বহিতে বহিতে ভাটিয়া এসেছে মরণ নদীর পার।

আমার বাপের গলাটী ধরিয়া কাঁদিত পাগল-পারা,
শাখায় শাখায় দেখা হ'ত যেন গেড়ে এক ডাল যারা।
স্নেহের দুখান বাহু আগলিয়া বাঁধিয়া লইত মোরে,
কারে কারে আমি কত ভালবাসি শুধাইত তারপরে।
ভাবিতাম কোন ভেস্তের দেবী এই বন-গেঁয়ো ঘরে,
এত যে দরদ কেন বুকে ওর এই অভাগার তরে।

সেবার শুনিনু বৈশাখ মাসে তিন দিনে কোন্ জ্বরে,
সেই দরদিয়া ঢলিয়া প'ড়েছে কবর নিঝুম ঘরে।

তারপর গেছে বহু দিন কাটি ছুনিয়ায় নানা ঘোরে,
কত ব্যথা আর কত কাঁদা আছে কে পারে রাখিতে ধ'রে
বহুদিন পরে আসিয়াছি আজ তাহার এ বুনো বাড়ী—
বড় সকরুণ ঘুঘুরা ডাকিছে খেজুরের পাতা নাড়ি।
কবরে তাহার আবরণ দেছে ঝরা তেঁতুলের পাতা,
ঘুমলী মেয়েরে চাদরে ঢেকেছে যেন আদরিণী মাতা।
তারি স্নেহ যেন পাইতেছি আমি এই বুনো তরু-ছায়ে,
ঠাণ্ডা হাওয়ায় তাহারি পরশ পুলকি উঠিছে গায়ে।

ভূতের ভয়েতে এই পথে যেতে সরেনা কাহার কথা,
রাত্রে কে নাকি আগুন জ্বালায় মাথায় জড়ায়ে কাঁথা।
আমিও দেখেছি সারাদিন সেয়ে, উউ উউ ক'রে কাঁদে,
শিথীল বাকল তেঁতুল পাতায় বাতাস দোলার নাদ।
রাত্রি বেলায় এই একা বনে জোনাকী-উজল রথে,
ছেলে মেয়েগুলি বক্ষে আগলি কেঁদে যায় পথে পথে।

*　　*　　*　　*

'ফুপুমা, ফুপুমা, বিদায়—বিদায়—বেলা বেড়ে গেল যাই,
এই গেঁয়ো ঘরে যত ব্যথা তব ভুলি নাই ভুলি নাই।'

কাটা ধানের বিদায়

আমি যাইরে আমি যাই ;
মঞ্জরী মোর কেঁদে ঝ'রে যায় ;
বেলা নাই—বেলা নাই।
চৈত্রদিনের ধূসর ধূলায়
উড়ে এসেছিনু দখিন হাওয়ায় ;
কৃষাণের স্নেহে ছেয়েছিনু হায়
সবুজেতে সব ঠাই ;
বেলা নাই—বেলা নাই।

ধরার মায়ের আদুরে দুলাল
মোরা নাচিতাম মাঠে,
মোদের মায়ায় পথিকের চলা
থেমে যেত সেঁয়ো বাঁটে ।
বরষার জলে গা খানি এলিয়ে
সবুজ আঁচল দিতাম ভাসিয়ে,
সাপলার ফুল কুড়িয়ে কুড়িয়ে
খেলিয়াছি ভাই ভাই,
যাইরে—আমি যাই।

শরতের কোন উতল হাওয়ায়
অন্তর গেল খুলে ;
সোণালী আলোর যত মায়া ছিল
ভরিলাম ফুলে ফুলে।

সহসা তুলিতে কি দেখিনু হায়
পায়ের ঝাজর কার বেজে যায়
সারা মাঠ ভরি কে গান শুনায়
বেলা নাই বেলা নাই ;
যাইরে—আমি যাই।

জানি জানি সই কল্‌মী বধূরা
কত যে কাঁদিবি তোরা,
ওই বুক হ'তে সিঁদুর শুখায়ে
কাঁদাবে সকল ধরা ;

যে মালীকা তোরা পরালি আদরে
ফেলে যেতে হ'ল শূনোবালু চরে
এ ব্যথারে মোরা ভুলিব কি ক'রে,
ভেবে যে বাঁচিনে তাই ;
যাইরে—আমি যাই !

মটর শুটীরা বিদায়—বিদায়—
বেলা নাই বেলা নাই,
রহিল এ মাঠ তোমরা ইহারে
সবুজে সাজিও ভাই ;
প'রে কানে কানে হিঙুলের দুল
শরীষার দোলা ক'রে দিও ভুল,
রাতে জ্বালি রাঙা জোনাকির ফুল
হাসাইও সব ঠাঁই,
যাইরে—আমি যাই।

কবি-পরিচিতি

জসীম উদ্‌দীনের কবিতার ভাব ভাষা ও রস সম্পূর্ণ নতুন ধরণের। প্রকৃত কবির হৃদয় এই লেখকের আছে। অতি সহজে যাদের লিখিবার ক্ষমতা নেই এমনতর খাঁটি জিনিষ তারা লিখিতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

William B. Fraking, Inc.
Transcontinental Lecture Tours,
New York

The 9th August, 1930

Dear Mr. Jasim Uuddin,

My friend Mr. Suresh Banerjee sent me two of your books which I have read with great pleasure.

Your power to continue a creative impulse is immense. Instead of a small canvas the pictures that you draw are large and incisive. In short, you are a poet of the first rank. There are few who can equal you (in any country) in the world. As for a superior, outside of D' Anunzio, you have none. But then, he is old and you are young. Given the time that you need to catch up with him I see no reason why you should not be the greatest poet in the world in fifteen years' time. In that time you will be forty five, precisely the prime of D' Anunzio.

I am proud, and grateful to you for writing in our divine Bengali than which there is no subtler living language in the world.

Yours Faithfully,
Sd/- Dhan Gopal Mukherjee,

নক্সী কাঁথার মাঠ

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ডি-লিট্

ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে বাঙ্গালা ভাষার শ্রী উল্টিয়া গিয়াছে। যেমন আজকাল দুধে ভেজাল, ঘিয়ে ভেজাল, মধুতে ভেজাল, মেঠাইএ ভেজাল, তেমনই এখন সাহিত্যেও ভেজালের ছড়াছড়ি। এমন যে তিলোত্তমা, তাতেও না কি রেবেকার ভেজাল আছে। উর্ব্বশী পড়িতে পড়িতে হঠাৎ এপিপ্‌সাইকিডিয়ান মনে পড়িয়া যায়। ইংরেজী সাহিত্য—ইংরেজী সমাজ আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্য ও বাঙ্গালা সমাজের গায়ে যে দাগ দিয়া যাইতেছে, তাহা বড় স্পষ্ট এবং সময়ে সময়ে কলঙ্ক স্বরূপ।

কিন্তু আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি। বাঙ্গালা পল্লীর শ্রী আমরা একবার দেখিয়াছিলাম,—বাঙ্গালী সাধ্বীর মাথায় বড় সিন্দুরের টিপটি দেখিয়াছিলাম,—নববিবাহিতা কিশোরীর কাঁকণ ও নূপুরের রুণুঝুনু শুনিয়াছিলাম,—শুভ্র রজনীগন্ধার ন্যায় শ্বেতবসনা বিধবার হোমাগ্নির মত উজ্জ্বল ব্রহ্মচর্য্য দেখিয়াছিলাম;—সেই পল্লীর স্বর্ণ-শ্রী—যাহাতে বাঙ্গালীর ঘরকন্না ঝল্‌মল্ করিত, তাহা আর যেন তেমন ভাবে দেখিতে পাই না। বিদেশের আমদানী বাহিরের চাকচিক্যপূর্ণ নানা অনুকৃতি প্রাণহীন খেলনার মত মনে হয়,—এখন এসব আর চোখে লাগে না। পল্লীর তরুণ তরুর ছায়া ও শ্যামল দূর্ব্বা এখন সহরের প্রাসাদ হইতে ভাল লাগে। এ দেশকে কেহ ঐশ্বর্য্য দিয়া দীর্ঘকাল ভুলাইয়া রাখিতে পারিবে না,—এ যে মাধুর্য্যের দেশ।

তাই আজ জসীমউদ্দিনের "নক্সী কাঁথার মাঠ" কাব্যখানি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এ যেন সেই পুরাতন পল্লীকে ফিরিয়া পাইলাম,—সেই পল্লীর পথ-ঘাট—এ যেন কত চেনা—হৃদয়ের দরদ দিয়া আঁকা। পাড়াগাঁয়ের মেয়ের দুটি ডাগর চোখ, পল্লীরাখালের চোখজুড়ানো কাল রূপ মুসলমান লেঠেলদের মারামারি—বাঙ্গালার বিবাহ-বাসর, গিন্নীর ঘর-কন্না—এই সকল দৃশ্যে বুক জুড়াইয়া গেল। এই পল্লী-দৃশ্য আমাদের চোখের সাম্‌নে ছিল—এখনও হয়ত কিছু কিছু আছে। কিন্তু এ সকল হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। এই হারানো জিনিষ নূতন পাওয়ার যে আনন্দ, কবি জসীমউদ্দিন তাহা আমাদিগকে দিয়াছেন। ইনি তরুণবয়স্ক কিন্তু বীর-বিক্রম। ইনি কবিতারাজ্যে যে পাঠশালা খুলিলেন, তাহা ইঁহার নিজের আবিষ্কার। জানিনা সহরে থাকিয়া কবি তাঁহার এই সবুজ প্রাণ, বঙ্গজীবনের অতুলনীয় গ্রাম্যসম্পদ—ঘরকন্নার এই সাঁঝের ভোগ হারাইয়া ফেলিবেন কি না।

সর্ব্ব-গ্রাসী সহরের মায়াজাল কাটাইয়া পল্লীর অনাবিল ভাব ও স্ফূর্ত্তি বজায় রাখা বড় শক্ত।

আমরা কাব্যখানির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

১৪টি ছোট ছোট দৃশ্যপটে এই কাব্যচিত্র সম্পূর্ণ। প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র অঙ্কে বাঙ্গলার কুটীরগুলির এক একটি দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। উহা যেমনই পূর্ণ, তেমনই কবিত্বময়। এই কবিত্ব সংস্কৃত বা ইংরেজী হইতে ধার করা নহে। কবি একজন গ্রাজুয়েট, ইচ্ছা করিলে সেরূপ ধার পাইতেন, কিন্তু তিনি সর্ব্বদা তাঁহার অপরিশোধনীয় পল্লীমাতৃকার ঋণ শোধ দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন,—কাহারও কাছে দান পাওয়ার জন্য হাত বাড়ান নাই।

প্রথমাঙ্কের বর্ণনীয় বিষয়,—একটি মাঠ দিয়া বিভক্ত করা দুইটি পাশাপাশি গ্রাম; সেই মাঠটিই কালে "নক্‌সী কাঁথার মাঠ" নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। দুইটি গ্রাম দুইটি ভ্রাতার মত জড়াজড়ি করিয়া আছে—ইহাদের মধ্যে ভাব ও অসদ্ভাব—কিছুরই অভাব নাই;—

"ও-গাঁ'র বধু ঘট ভরিতে যে ঢেউ জলে লাগে,
কখন্ কখন্ দোলা তাহার এ গাঁয় এসেও লাগে।
এ-গাঁ'র চাষী নিঘুম রাতে বাঁশের বাঁশীর সুরে
ওই না গাঁয়ের মেয়ের সাথে গহন ব্যথায় ঝুরে।
এ-গাঁও হ'তে ভাটীর সুরে কাঁদে যখন গান,
ও-গাঁ'র মেয়ে বেড়ার ফাঁকে রয় সে পেতে কান।
এ-গাঁও ও-গাঁয় মেশামেশি কেবল সুরে সুরে,—
অনেক কাজে এরা ওরা অনেকখানি দূরে!"

এই ভাবের বিনিময় সত্ত্বেও সময়ে সময়ে সুরটা বেসুরো হইয়া বাজে:—

"এ-গাঁর লোকে করতে পরখ্ ও-গাঁর লোকের বল।
অনেক বারই লাল করেছে জলীর-বীলের জল।"

দ্বিতীয় অঙ্কে কাব্য-নায়ক কিশোর-রূপার চিত্র। রূপা চাষার ছেলে—তাহার বর্ণটি কালো। এই কালো রূপে সে সমস্ত গ্রামটি আলো করিয়া রাখিয়াছে। মুসলমান কবির চোখে এই কালো রংটি সকল রংএর সেরা—এখানে ইনি বৈষ্ণব কবির মত:—

কালোয় যে জন আলো বানায়, ভুলায় সবার মন,
তারির পদরজের লাগি' লুটায় বৃন্দাবন।"

রূপা শুধু কালো রং ও কিশোর মূর্তি দিয়া সেই গ্রামটি মুগ্ধ করে নাই,

"আখড়াতে তার বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানী,
খেলার দলে তারে নিয়েই সবার টানাটানি।
জারীর গানে তাহার গলা উঠে সবার আগে,
"শাল সুন্দী বেত" যেন ও, সকল কাজেই লাগে।"

তৃতীয় অঙ্কে নায়িকা সাজুর কথা। কবি বলিতেছেন, এই রূপসী কিশোরী "তুলসীতলার প্রদীপ যেন জ্বলছে সাঁঝের বেলা।" সে যেন "দেবদেউলের ধূপ"; কিন্তু মন্দিরের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়াও তিনি মুসলমানের গৃহের আঙিনার কথা ভুলিয়া যান নাই :—

সাজুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "লাল মোরগের পাখার মত ওড়ে তাহার শাড়ী"। সাজু হাঁড়ির উপর নানারূপ সুন্দর চিত্র আঁকিতে জানে, সিকায় ফুল তুলিতে তাহার হাত অতি নিপুণ। "বিয়ের গানে ওরই সুরে সবারই সুর কাঁদে; সাজু গাঁয়ের লক্ষ্মী মেয়ে বলে কি লোক সাধে?"

ইহার পরে কয়েক অঙ্কে শ্যামল কিশোর নায়ক ও কিশোরী গৌরী সাজুর প্রেমের লুকাচুরি খেলা;—এখানে যৌবনের উদ্দাম স্ফূর্তি, করস্পর্শে অঙ্গে বিদ্যুৎ ব'য়ে যাওয়া, রূপের ফাঁদে প্রেমিককে পাড়িয়া ফেলিয়া তাহার জীবনমরণ সমস্যার সৃষ্টি করা—এ সকল দুরন্ত অভিনয়ের কিছুই নাই। কিশোর-কিশোরী এখানে আদতেই খেলোয়াড় নহে—ইহারা ভালবাসার পাঠ নূতন শিখিতেছে। সাজু মেঘের পূজার মাগুন চাহিতে চলিয়াছে—সঙ্গে চার জন খেলার সাথী। রূপার মা তাহাদিগকে একসের ধান দিলেন। কিন্তু হঠাৎ সাজুকে দেখিয়া পরম উত্তমে রূপা আসিয়া বলিল :—"এই দিলে মা থাকবে না আর মান," এবং আরও পাঁচসের দিয়া তরুণ হৃদয়ের অনুরাগের উৎসাহ ও আবেগ দেখাইল। রূপা বাঁস কাটিতে গিয়াছে, সেখানে আবার সাজুকে দেখিতে পাইল;—প্রাণে পুলক, তাহা ঢাকিতে পারিতেছে না,—দেখিবার ইচ্ছা প্রবল কিন্তু লজ্জায় সাহস করিয়া চক্ষু মেলিতে পারিতেছে না —কিশোর বয়সের এই সপ্রতিভ লাজুকতার চিত্র কবি এমন নিপুণ তুলিতে

আঁকিয়াছেন—তাহার সমালোচনার চেষ্টা বৃথা মনে হয়—কেবল বলিতে ইচ্ছা করে "কি সুন্দর!" সাজুর মা রূপাকে আদর করিয়া খাওয়াইতেছেন—রূপা যাহা খায় তাহাই প্রশংসা করিতেছে—সেই প্রশংসা শুনিয়া সাজুর মুখ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিতেছে—কারণ সেই ত রান্না করিয়াছে। তার পরে শত ছলে ও ছুতোয় রূপা কতবার সাজুদের বাড়ীতে যাইতেছে। সেই সকল ছলনা প্রায় ধরা পড়িয়া যাইতেছে। একদিন সে হঠাৎ তথায় উপস্থিত হওয়াতে সাজুর মা জিজ্ঞাসা করিল—"অসময়ে এসেছ কেন বাবা?" সে বলিল "খালা মা, তোমার জ্বর হয়েছে শুনেছি, তাই তোমার খাবার জন্য আধ সের গজা কিনে এনেছি।" "কই, আমার তো জ্বর হয়নি! আর জ্বর হ'লে কি গজা খায় কেউ?' সাজুর মাএর উক্তিতে বালকের অসতর্ক চাতুরী ধরা পড়িয়া গেল, সে লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। এরূপ লুকোচুরি খেলা অনেক আছে "এমনি করিয়া দিনে দিন যেতে দুইটি তরুণ, এ উহারে নিল বরণ করিয়া বিনি-সূতি মালা দিয়া।"

কিন্তু এবার দুইজনেই কিশোর বয়সের সীমা অতিক্রম করিয়া যৌবনের অকূল সমুদ্রে পড়িয়াছে। তখন যাহা সরল ও অনাবিল ছিল—তাহা জটিল সমস্যায় দাঁড়াইল। কৈশোরের উচ্ছল লীলাখেলা সংযমের বাধা মানিয়া চলিল—তথাপি বেলফুলের ন্যায় অতি নির্ম্মল দুইটি প্রাণের কথা লইয়া দুষ্ট প্রতিবেশীরা নির্ম্মম ভাবে টানা-হেঁচড়া করিতে ছাড়িল না;—তাহারা কলঙ্ক রটাইতে সুরু করিল, অকর্ম্মা সংবাদবাহী বুড়দের গ্রাম্য অবসর পূরণের বেশ একটা সুযোগ জুটিয়া গেল। "টুনীর ফুপু আসিল হাতে ডলতে তামাক পাতা, এমন সময় ওই গাঁ হ'তে আসিল খেঁদির মাতা; ক'জনকে আর থামিয়ে রাখে?"—এই অযাচিত নিন্দা ও উপদেশে সন্ত্রস্ত হইয়া রূপার মা তাঁহার ছেলের সঙ্গে সাজুর বিবাহ স্থির করিয়া পাড়া-পড়শীর শাণিত জিহ্বা ভোতা করিরা দিলেন। এই বিবাহের ঘটকালী হইতে বাসর রজনীর শেষ পর্য্যন্ত কবি যে দৃশ্যপট আঁকিয়াছেন, তাহা বঙ্গীয় কৃষকগৃহের একখানি নিখুঁৎ সামাজিক চিত্র। দুখাই ঘটক বিবাহের প্রস্তাব লইয়া সাজুর মায়ের কাছে যাইতেছে; কবি লিখিতেছেন :—

"দুখাই ঘটক নেচে চলে, নাচে তাহার দাড়ী,
বুড়ো বটের শিকড় যেন চলছে নাড়ি' নাড়ি'।
ধানের জমি বাঁয় ফেলিয়া—ডাইনে ঘন পাট,
জলীর-বিলে নাও বাহিয়া ধরল গাঁয়ের বাট।"

বিবাহের আসরের বর্ণনা খুব একটা জম্‌কালো রকমের—

"বিয়ের কুটুম এসেছে আজ সাজুর মায়ের বাড়ী,
কাছারী ঘর গুম্‌গুমাগুম্—লোক হয়েছে ভারি।
গোয়াল-ঘরে ঝেড়ে পুছে বিছান দিল পাতি',
বসল গাঁয়ের মোল্লা-মোড়ল গল্পগানে মাতি'।
পড়ে কেতাব গাঁয়ের মোড়ল নাচিয়ে ঘন দাড়ী,
পড়ে কেতাব গাঁয়ের মোল্লা মাঠ-ফাটা ডাক ছাড়ি'।"

তারপরে মিঞারা কত কেচ্ছা শুনাইয়া সমবেত লোকদের মন-হরণ করিতেছেন,—হানিফের কথা, জয়গুণ বিবির কথা শুনিয়া লোকেরা মাতিয়া গিয়াছে,—হানিফের যুদ্ধ-বর্ণনায় খুব বাহাদুরী—

"কাতার কাতার সৈন্য কাটে যেন কলার বাগ,
মেষের পালে পড়েছে যেন সুন্দর-বনি বাঘ।"

এদিকে আবার—

"উঠান'পরে হল্লা করে পাড়ার ছেলে-মেয়ে,
রঙীন বসন উড়ছে তাদের নধর তনু ছেয়ে।"

পরের অঙ্কে রূপা ও সাজুর গৃহস্থালী। এইখানে বাঙ্গালী চাষী-জীবনের সুখ-দুঃখ ও জীবনের মূল সূত্রটী অতি স্পষ্ট রেখায় আঁকা হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি সাজু স্বামীর পায়ের টিপ্ পরিয়া কত আহ্লাদে অবিশ্রান্ত গৃহকর্ম্ম করিতেছে; অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত ধানের মলন চলিতেছে—নবীনা "কৃষাণী "ঢেকির পাড়েতে মুখর করিছে একেলা সারাটি বাড়ী।" কোন কোন দিন হেমন্তের জ্যোৎস্নায় সাজু "ঘুমিয়া পড়িছে ঝাড়িতে ধান।" সারাদিনের শ্রান্তির পর দম্পতির সুখ শয়ন। এক রাত্রির কথা এইরূপ:—

"সেদিন রাত্রে বাঁশী শুনে শুনে বউটি ঘুমিয়ে পড়ে,
তারি রাঙা মুখে বাঁশী-সুরে রূপা বাঁকা চাঁদ এনে ধরে।
তার পর খুলে' চুলের বেণীটি বার বার ক'রে দেখে,
বাহুখানি দেখে নাড়িয়া নাড়িয়া বুকের কাছেতে রেখে।
কুসুম ফুলেতে রাঙা পাওদু'টি দেখে আরো রাঙা করি',
মৃদু তালে তালে নিশ্বাস লয়, শুনে মুখে মুখ ধরি'।
ভাবে রূপা ও যে দেহ ভরি' যেন এনেছে ভোরের ফুল,
রোদ উঠিলেই শুকাইয়া যাবে, শুধু নিমিষের ভুল।"

একাদশ অঙ্কে জমি লইয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামা। রূপা চাষার ছেলে—কিন্তু বাঙ্গালী সন্তান—তার প্রাণের প্রেম ও হাতের লাঠি উভয়ই অতুলনীয়,

তাহার হাতে বাঁশের বাঁশী ও বাঁশের লাঠি এ দুইই অনিবার্য্য—একদিকে সে ফুল-সম মৃদু মৃদু হিল্লোলে প্রেমের গান গাহিতেছে, অপরদিকে ঝগড়ার স্থলে সে দুর্দ্দান্ত পশুর মত। দুই দলে বিবাদ বাধিয়াছে—তরুণ রূপা এক দলের নেতা। মত্তহস্তী যেরূপ শতদলের বেষ্টনী হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়, রূপা এক মুহূর্ত্তে সাজুর কোমল আলিঙ্গন হইতে নিজকে বিমুক্ত করিয়া নির্ম্মম উৎসাহে রণভূমির দিকে চলিয়াছে :—

"আলী আলী আলী আলী রূপার যেন কণ্ঠ ফাটি'
ইস্রাফিলের শিঙ্গা বাজে, কাঁপছে আকাশ, কাঁপছে মাটি।
তারি স্বরে সব লাঠেলে লাঠির' পরে হান্‌ল লাঠি,
আলী আলী শব্দে তাদের আকাশ যেন ভাঙবে ফাটি'।
আগে আগে ছুটল রূপা, বোঁ বোঁ বোঁ সড়কি ঘোরে,
কাল সাপের ফণার মত বাবড়ী-মাথার চুল যে ওড়ে।
চল্‌ল পাছে হাজার লাঠেল আলী আলী শব্দ করি,,
পায়ের ঘায়ে মাঠের ধুলো আকাশ বুঝি ফেল্‌বে ভরি'।
চল্ল তারা মাঠ পেরিয়ে, চল্ল তারা বিল ডিঙিয়ে'
কখন্ ছুটে, কখন হেঁটে বুকে বুকে তাল ঠুকিয়ে।
চল্ল যেমন ঝড়ের দাপে ঘোলাট্টি মেঘের দল ছুটে যায়,
বাওকুড়ানীর মতন তারা উড়িয়ে ধুলি পথ ভরি' হায়!"

বর্ণনাগুলি এরূপ জীবন্ত, মনে হয় যেন আমরা রণক্ষেত্রের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি এবং দুই দলের উন্মত্ত বীরমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতেছি।

রূপা খুনের দায়ে পড়িয়া পুলিশের হাত হইতে নিস্তার পাওয়ার জন্য পলাইয়া গিয়াছে—

"ঘরের মেঝেতে সপটি ফেলায়ে বিছায়ে নক্‌সী কাঁথা,
সিলাই করিতে বসিল যে সাজু একটু নোয়ায়ে মাথা।
পাতায় পাতায় খসখস করে, শুনে' কান খাড়া করে,
যারে চায় সেত আসে নাক শুধু ভুল ক'রে ক'রে মরে।
তবু যদি পাতা খানিক না নড়ে ভাল লাগে নাক তার,
আলো হাতে ল'য়ে দূর পানে চায়, বার বার খুলে দ্বার।"

ইহা গ্রাম্য ভাষায় জয়দেবের "পততি পতত্রে, বিগলিত পত্রে"র অনুবাদ। সেই রাত্রে যখন আকাশের গায় শুকতারা ডুবু ডুবু—শেষ রজনীর চাপা নিশ্বাস অতি ধীরে বাঙ্গালার কুটীরে বহিতেছে, চোখে পলক নাই, সাজু বসিয়া আছে। এমন সময় রূপা চোরের মতন ঘরে ঢুকিল। সুন্দরী গৃহিণীকে নিঃসহায় ভাবে ঘরে একেলা ফেলিয়া যাইতে যে মর্ম্মান্তিক কষ্ট তাহা অতি অল্প কথায় রূপা ব্যক্ত করিতেছে। রূপার মা মারা গিয়াছেন, সাজু সেই শূন্য ঘর একলাটি কিরূপে আগলাইয়া থাকিবে? আজ শেষ

আর দেখা হইবে না—এই আলিঙ্গন শেষ আলিঙ্গন! রূপা অকূলে ঝাপ দিবে। সাজুর কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রু-চক্ষে বলিল :—

"মাকড়ের আঁশে হস্তী যে বাঁধে
পাথর ভাসায় জলে
তোমায় আজিকে সঁপিয়া দিলাম
তাঁহার চরণ-তলে।"

"মোর কথা যদি মনে পড়ে সখি, যদি কোন ব্যথা লাগে,
দুটি কালো চোখ সাজাইয়া নিও কাল কাজলের রাগে।
সিন্দুরখানি পরিও ললাটে—মোরে যদি পড়ে মনে,
রাঙা সাড়ীখানি পরিয়া সজনি চাহিও আরশী-কোণে।
মোর কথা যদি মনে পড়ে সখি যতনে বাঁধিও চুল,
আলসে হেলিয়া খোপায় বাঁধিও মাঠের কলমী ফুল।
আর যদি সখি মোরে ভালবাস, মোর তরে লাগে মায়া,
মোর তরে কেঁদে ক্ষয় করিও না অমন সোনার কায়া!"

ইহার পর শেষাঙ্ক। কত বৎসর ধরিয়া সাজু একখানি কাঁথার উপর গৃহসন্নিহিত মাঠটির ছবি নক্সা করিয়া সূতায় বুনট করিতেছিল। যেদিন এই নক্সী কাঁথা সেলাই করিতে আরম্ভ করে, তখন :—

"স্বামী ব'সে তার বাঁশী বাজায়েছে—শেলাই করছে সে যে,
গুন্ গুন্ ক'রে গান কভু রাঙা ঠোটেতে উঠেছে বেজে।"

এই কাঁতা তৈরী করার সঙ্গে তাহার কত মধুর স্মৃতি জড়িত। সে-সকল দিন চলিয়া গিয়াছে। এবার কোমল হস্তে সে নক্সার শেষ রেখাটি টানিল —"খুব ধ'রে ধ'রে আঁকিল সে সাজু রূপার বিদায়-ছবি, খানিক যাইয়া ফিরে' ফিরে' আসা—আঁকিল সে তার সবি।"

কাঁথা আঁকার পালা এবার শেষ; কাঁথাখানি মেলিয়া সাজু নিজের বিছানার উপর ছড়াইয়া দিল—সেই শয্যাই তাহার মৃত্যুশয্যা; যখন চিরনিদ্রার ভরে চোখদুটি মুদিয়া আসিতে লাগিল, তখন সে পার্শ্ববর্ত্তিনী সোনা-মাকে বলিল :—

"সোনা-মা আমার, সত্যিই যদি তোরে দিয়া যাই ফাঁকি"

তবে

"এই কাঁথাখানি বিছাইয়া দিও আমার কবর 'পরে
ভোরের শিশির কাঁদিয়া কাঁদিয়া এরি বুকে যাবে ঝ'রে।
সে যদি আবার ফিরে আসে কভু, তার নয়নের জল,
জানি জানি মোর কবরের মাটি ভিজাইবে অবিরল।
হয় ত আমার কবরের ঘুম ভেঙে যাবে সাগো তাতে,
হয় ত তাহারে কাঁদাইয়া আমি জাগিব অনেক রাতে।
একথা সে মাগো কেমনে সহিবে, ব'ল তারে ভাল ক'রে।
তার আঁখিজল ফেলে যেন এই নক্সী কাঁথার 'পরে।"

সাজুর মৃত্যু পর বহুদিন চলিয়া গিয়াছে—রূপাকে গ্রামের সকলে ভুলিয়া গিয়াছে ঃ—

"বহুদিন পরে গাঁয়ের লোকেতে
গভীর রাতের কালে
শুনিল কে যেন বাজাইছে বাঁশী
বেদনার তালে তালে।
প্রভাতে সকলে আসিয়া দেখিল
সেই কবরের গায়
রোগপাণ্ডুর একটী বিদেশী
মরিয়া র'য়েছে হায় !
সারা গায়ে তার জড়িয়ে র'য়েছে
সেই সে নক্‌সী কাঁথা।—
আজও গাঁ'র লোকে বাঁশী বাজাইয়া
গায় এ করুণ গাথা।

নক্‌সী কাঁথার মাঠে এমন অনেক কথা আছে, যাহা বাঙ্গলার আর কোন কবি এভাবে লিখিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। গ্রামের মেয়েরা মেঘকে আবাহন করিতেছে—এই সকল মেঘ যে কত রূপে, কত লীলায় আকাশে বিচরণ করে, তাহা এদেশের কৃষকেরা লাঙ্গল ঘাড়ে ফেলিয়া ঊর্দ্ধমুখে লক্ষ্য করিয়া তাহাদের নামকরণ করিয়া দিয়াছে, পল্লীবালিকারা তাহাই আবৃত্তি করে। শিক্ষিত পাঠক পুষ্কর, আবর্ত্ত প্রভৃতি মেঘের 'ভুবনবিদিত' নাম অবশ্য জানেন, কালিদাসের কৃপায় তাহা মুখস্থ আছে; কিন্তু বাঙ্গলার চাষীরা মেঘকে আদর করিয়া যে কত নাম দিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

বালিকারা মেঘদর্শনে উল্লসিত হইয়া মেঘগুলিকে নাম ধরিয়া আহ্বান পূর্ব্বক স্তবস্তুতি করিতেছে ঃ—

'কালো মেঘা' নামো, নামো, 'ফুল তোলা মেঘ' নামো,
'ধুলট মেঘা' 'তুলট মেঘা', তোমরা সবে নামো !
'কানা মেঘা' টল্ মল্ বার মেবার ভাই,
আরো 'ফুটিক' ঢলক দিলে চীনার ভাত খাই।
'কাজল মেঘা' নামো নামো, চোখের কাজল দিয়া
তোমার ভালে টীপ আঁকিব মোদের হ'লে বিয়া।
'আড়িয়া মেঘা' 'হাড়িয়া মেঘা' 'কুড়িয়া মেঘা'র নাতি,
নাকের নলক বেচিয়া দিব তোমার মাথার ছাতি।
কৌটা-ভরা সিন্দুর দিব 'সিন্দুর মেঘা'র গায়,
আজকে যেন দেয়ার ডাকে মাঠ ডুবিয়া যায়।"

গ্রামের মুসলমান মেয়েরা এখনও বোধ হয় এই ভাবের একটা ছড়া গাহিয়া থাকে—কবি তাহা আধুনিক ছন্দে সাজাইয়াছেন। বাঙ্গলাদেশে বাঁশের যত প্রকার শ্রেণীভেদ আছে—তাহারও একটা তালিকা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাকে বোধ হয় তালিকা বলা ঠিক হইবে না,—নীরস শুষ্ক কথাগুলি কবির হাতে পড়িয়া বেশ কাব্যময় ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।

নক্‌সী কাঁথার মাঠের কবি দেশের পুরাতন রত্ন-ভাণ্ডারকে নূতন ভাবে করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে অনাগত রাজ্যের বার্ত্তা বহিয়া আনিয়াছেন। 'রাখালী' নামক কাব্যে ইহাঁর প্রতিভার যে পরিচয় পাইয়াছিলাম, নক্‌সী কাঁথার মাঠে তাহার পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাইতেছি। বহুদিন হইল শরৎচন্দ্রের বিশ্ববিশ্রুত প্রতিভার পরিচয় পাইয়া আমি ভারতবর্ষে তাঁহার প্রথম অভিনন্দন জানাইয়াছিলাম, আজ নক্‌সী কাঁথার মাঠের কবিকেও আমি কিঞ্চিৎ দ্বিধার সহিত সম্বর্দ্ধনা জানাইতেছি। বাঙ্গলা সাহিত্যে কাব্যের পাঠ একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। কণিকাতে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, একটা মহাকাব্য রচনার তাঁহার সাধ ছিল, কিন্তু তাঁহার মর্ম্মের কথা শত সুরে বাজিয়া উঠিল এবং মহাকাব্যের স্থান গীতকবিতা অধিকার করিয়া বসিল। কবি হয় ত ইহা পরিহাস করিয়াই বলিয়াছিলেন, কিন্তু কবির এই উক্তির পর বাঙ্গলার উদীয়মান কবিরা কবিতায় উপাখ্যান রচনা ছাড়িয়া দিলেন। রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনীর ধরণে মাঝে মাঝে ছোট ছোট কাব্যোপাখ্যান পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু অধুনা কাব্যের বাজার বড় মন্দা। জসীম উদ্দিনের এই বইখানি ছেটে লইলেও ইহা একখানি কাব্য, ইহার উপাদান বাঙ্গালীর চিরাভ্যস্ত গীতকবিতার কতকগুলি সুর ও ছন্দ, কিন্তু নানা সুর একত্র করিয়া একটা বড় রাগিণী সৃষ্টি করার শিল্প-শক্তি ইহার আছে। নানা কুসুমের মালার মত খণ্ড কবিতাগুলিকে একটা অখণ্ড রূপ দেওয়ার বিলক্ষণ শক্তি ইনি দেখাইয়াছেন; ইহাতে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষমতা ও প্রচুর সৌন্দর্য্যের সমাবেশ দেখা যায়। অবনীন্দ্র বাবু এই কাব্যের ভূমিকায় কতকটা দ্বিধার সঙ্গে পুস্তকখানি প্রশংসা করিয়াছেন, সেই দ্বিধার ভাব আমারও আছে, যেহেতু এক সময় যাহা বলিতাম ও লিখিতাম তাহার উপর আমার প্রচুর আস্থা ছিল, কিন্তু এখন প্রতিক্ষণে মনে হয়, বাঙ্গলার নব আশা আকাঙ্ক্ষাদৃপ্ত তরুণের নূতন জগৎ ঠিক আমার কথায় সায় নাও দিতে পারেন, হয় ত যে যুগ আসিয়াছে, আমরা তাহার পশ্চাতে পড়িয়া গেছি। তরুণের সঙ্গে প্রাচীনের পা' ফেলিয়া সমান তালে চলা শক্ত। তবে আমি আমার মনের কথা লিখিয়াছি—মনের শৈশব নাই, যৌবন ও বার্দ্ধক্য নাই। মনের কথা বলিলে তাহার সম-মর্ম্মী শ্রোতা হয় ত জুটিয়া যাইতে পারে।

বিচিত্রা, বৈশাখ, ১৩৩৯। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

রাখালী

কবিতার বই। জসীম উদ্দিন প্রণীত। মূল্য এক টাকা। ৬২ পৃষ্ঠা।

নবীন কবিদের মধ্যে এই কবিটির রচনা কিছুকাল হইতে লক্ষ্য করিতেছি। ইঁহার সম্বন্ধে সুহৃদ্বর ডাঃ সুনীতিকুমারের সহিতও সেদিন আলোচনা হইতেছিল। সুনীতিও আমাকে ইঁহার রচনাগুলি লক্ষ্য করিতে বলিতেছিল। গত দুই বৎসরে কল্লোল পত্রিকায় শ্রীমানের যে কবিতাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলি আমি পড়িয়াছিলাম। তাহাতে শ্রীমানের অঙ্কুরিত কবিশক্তির পরিচয় পাইয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। এই পুস্তকখানিতে কল্লোলে প্রকাশিত ছয়টি কবিতা ছাড়া আরও কয়েকটি কবিতা আছে। 'কবর' কবিতাটি—Matric Selection এ আগেই পড়িয়াছি। আগামী বৎসর পরীক্ষার্থীদিগকে কবিতাটি পড়াইতেও হইবে।

বঙ্গসাহিত্যে Pastoral Songs লেখার জন্য কবি কুমুদরঞ্জনের খ্যাতি আছে। কবি কুমুদরঞ্জন রাঢ়দেশের লোক। রাঢ়দেশের রীতি-প্রকৃতি ও পল্লীজীবনটি কুমুদরঞ্জনের কবিতায় বেশ ফুটিয়াছে। জসীমউদ্দিনও Pastoral Poems লিখিয়াছেন—রাখালিয়া সুরে। পুস্তকের নামও রাখালী। জসীমউদ্দিন যে দেশের পল্লীপ্রকৃতির আবহাওয়ায় ও পল্লীসমাজে বাল্য কিশোর যাপন করিয়াছেন, সে দেশ ভৌগোলিক হিসাবে বাংলাদেশ হইলেও রাঢ় দেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। দেবমাতৃক রাঢ়-দেশের নরনারীর জীবন ও প্রকৃতির লীলা-বৈচিত্র্য নদীমাতৃক পূর্ব্ববঙ্গ হইতে রীতিমত বিভিন্ন। জসীমউদ্দিনের রাখালিয়া গান পূর্ব্ববঙ্গের নদীর চড়া হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে। তাই ইহা বঙ্গসাহিত্যের অভিনব সম্পদ্।

তারপর যতীন্দ্রমোহন ও কুমুদরঞ্জন বঙ্গের পল্লীপ্রকৃতিকে দেখিয়াছেন হিন্দুর চোখে। শ্রীমান জসীমউদ্দিন তাহাকে বাঙ্গালীর চোখে দেখিয়াছেন অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের দৃষ্টিতেই দেখিয়াছেন। সে হিসাবেও কবিতাগুলির অভিনবত্ব আছে।

জসীমউদ্দিনের কবিতার ভাষা তাহার আখ্যানবস্তু ও তাহার আবহাওয়ার সম্পূর্ণ উপযোগী। বাঙ্গালীর নিজস্ব স্বাভাবিক ভাষাতেই কবিতাগুলি লিখিত।

জসীমউদ্দিন কবিতার মধ্যে এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—যাহা আমাদের সুপরিচিত নয় বলিয়াই ভয়ে ভয়ে শ্রীমান্ সেগুলিকে ত্যাগ না করিয়া ভালই করিয়াছে। কবি শব্দগুলিকে জোর করিয়া—ভাষার বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্যই প্রয়োগ করেন নাই। ঐ শব্দগুলি ব্যবহার না করিলে রচনার স্বাভাবিকতা নষ্ট হইয়া যায়—রসসৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটে। বেশ ত! উহাতে আমাদের শব্দসম্পদ্ বাড়িল—লাভই হইল। রাখালিয়া ভাষাতেই যে গানগুলি রচিত, সেগুলি আমার সব চেয়ে ভাল লাগিল।

সম্মিলনী—১লা পৌষ, ১৩৩৯।

কুমারী পুষ্পলতা দে

কবি জসীম উদ্‌দীনের 'নক্সী কাঁথার মাঠ' ও 'রাখালী' আমরা পাঠ করিয়াছি। বর্ত্তমানে কাব্যখানি পঞ্চদশটী নাতিদীর্ঘ কবিতার সমষ্টি। সকল কবিতাগুলিই ইতঃপূর্ব্বে 'কল্লোল', 'প্রবাসী', 'উত্তরা', 'মোহাম্মদী', 'সওগাত' ও 'মুয়াজ্জীন' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কবি সেই বিক্ষিপ্ত সুখ-দুঃখের বালু-কণাগুলিকে একত্র করিয়া এই 'বালুচর' গড়িয়াছেন। নদীর জল পথ পাইয়া মাঝে মাঝে ইহার উপর শীর্ণ জল-রেখা টানিয়া গেলেও, আসলে ইহা একখানি বালুচর। এই বালুচরে খেলা করিয়াছি পল্লীর তুমি-আমি, ঘরে-বাহিরের তুমি-আমি, স্বপ্ন-লোকের তুমি-আমি। বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এই তুমি-আমিতে জড়াইয়া আছে পূর্ব্ব-বঙ্গের পল্লীর আকাশ, পল্লীর বাতাস—পল্লীর সুষমা। 'বালুচরে' আছে তুমি-আমির অত্যুচ্চ আকাঙ্খা, অনন্ত তৃষ্ণা, নিকটের আনন্দ-নিরানন্দ, দূরের বেদনা-বিরহ—এক কথায় চিরন্তনী পাওয়া-না-পাওয়ার আদি-পরিণতি।

বাঙ্গলার অধিকাংশ কবি এবং লেখকের ন্যায় কবি জসীমউদ্‌দীনও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদ পাইয়াছেন। কিন্তু এ আশীর্ব্বাদ প্রকৃত কবি হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া; তাই ইহাতে একটু বৈশিষ্ট্য আছে।

বালুচরের গাঁথা দেখিয়া মনে হয়, কবি বাস্তব-রাজ্যে অতি বড় আঘাত পাইয়াছেন; কিন্তু এই বয়সেই সেই কারণে মুসাফিরের গান গাহিয়া ভাল করেন নাই—তাহাতে আরও পাঁচজনে আঘাত পাইবে।

যাই হোক, কাব্যাংশ আলোচনায় বালুচরের মিলন ও বিরহ—উভয়ই বড় মধুর বলিয়া প্রতীয়মান হইল। অনন্তকালের আসার আশা যখন নিকটে আসে, তখন সে নিকটও কাটিতে চাহে না। সেই না-কাটা কবির ছন্দে ধরা পড়িয়াছে।

"কাল সে আসিবে, মিছাই ছিঁড়িছি
আঁধারের কালো কেশ,
আজকের রাত পথ ভুলে বুঝি
হারাল উষার দেশ।"

তারপর কাল সে আসিয়াছিল, কিন্তু দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আসার আনন্দ তার যোগ্য আসন খুঁজিয়া পাইল না :—

"বুকে যে তোমারে রাখিব, বন্ধু, বুকেতে শ্মশান জ্বলে ;
নয়নে রাখিব ? হায়রে অভাগা ভাসিয়া যাইবি জলে।"

তাই মানুষের স্কন্ধে দোষ চাপিয়াছে :—

"শুধু মানুষেরে পায় না মানুষ, নাহি কারো অধিকার,
মানুষ সবারে পাইল এ-ভবে মানুষ হল না কার।"

তথাপি না-পাওয়াও একজনের ভাল লাগাতে প্রতিদান দেয় :—

"যে মুখে সে কহে নিঠুরিয়া বাণী,
আমি লয়ে সখি, তারি মুখখানি,
কত ঠাঁই হতে কত কি যে আনি, সাজাই নিরন্তর
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।"

চিন্তারাজ্যে তাহাকে লইয়া কবি অনেক কিছুই করিতে পারেন, কিন্তু সম্মুখে তাহাকে আর সাধা যায় না। তখন অভিমানে কবিকে জগৎ ছাড়িতে হয় :—

"মাটীর দেবতা লবে পূজা ভার
নাহি যদি লয় হেলা নাহি তার ;
আসিবেনা কভু পায়ে দলিবার, জীবনের অকাতরে—"

বর্ত্তমানের আবহাওয়া কাটাইয়া কবির এই উক্তি প্রশংসনীয়। কিন্তু আবার কেন কবিকে সবুজের ছোঁয়াচ লাগিল :—

"তোমাকে স্মরিয়া কাঁদিতেছি আমি,
চোখে পোকা লাগিয়াছে
তাই এত জল, প্রত্যয় নাহি
শুধাও না কারো কাছে ?"—

জগৎ ছাড়িয়াও এমন করিয়া 'ভাবের ঘরে চুরি, না করিলেই ভাল হইত।

যুগ-যুগান্তের অমীমাংসিত সমস্যা কবিকে আবার ঠেলা দিয়াছে। কবি—মুসাফির ; সব দেখিতেছে, সব শুনিতেছে, তাই :—

"চলেছে পথিক—রহিয়া রহিয়া করিছে আর্ত্তনাদ,—
ও যে ধরার সকল সুখের জীবন্ত প্রতিঘাত।"

দূরে—অতি দূরে সরিয়া যাইয়া না-পাওয়ার সুখকে কবি শেষে অনুভব করিয়াছেন—আনন্দ পাইয়াছেন ; অকুলেতে কূল গড়িয়া কবি তৃপ্তির আশা মিটাইয়াছেন :—

"এ জীবনে মোর এই গৌরব
তোমারে যে পাই নাই,
আর কারো কাছে না পাওয়ার ব্যথা
সহিতে হয়নি তাই।"

চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ

নিকষমণি

(বারীন্দ্রকুমার ঘোষ)

জসীম উদ্দীনের "**বালুচর**" কবিতার বই। বইখানির প্রচ্ছদের ছবি এঁকেছেন শিল্পী শ্রেষ্ঠ নন্দলাল। বিজলিতে আমরা জসীমের "নক্সীকাঁথার মাঠে"র অন্তরের সৌন্দর্য্য—তার আঁকা পদ্মাপারের গ্রামের ঘোষণার ছবি খুলে দেখিয়াছিলাম। বালুচরের কবি সেই কর, সেই ছবি, সেই রূপরেখা আবার জাগিয়েছেন।

বাঁশরী আমার হারায়ে গিয়াছে
বালুর চরে
কেমনে পশিব গোধন লইয়া
গাঁয়ের ঘরে ?

*   *   *

কোথায় খেলার সাথীরা আমার
কোথায় ধেনু,
সাঁঝের হিয়ায় রাঙিয়া উঠেছে
গোখুর রেণু

*   *   *

সাঁঝের শিশির দুটি পাও ধরে
কাঁদিয়া ঝরে
বাঁশরী আমার হারায়ে গিয়াছে
বালুর চরে।

জিতা রহো ভাই, বাঙলার কবি! কে বলে তুমি মুসলমান, কে বলে তুমি হিন্দু, তুমি ত অত ছোট নও যে ধর্ম্মের ময়ূরপঙ্খী দাঁড় কাক সাজিবে। বাঁশী তোমার চিরদিনই হারাইয়া যাক ঐ পদ্মা ব্রহ্মপুত্রের বালুরচরে বালুরচর জুড়িয়া উঠুক তোমার রূপের রেখা, ধ্যানের গীত, শ্রোতের দরদ, আম বনের মায়া, ঢাকাই সীমের আচল, চিরদিনই সেই হারান বাঁশীর সুরে।

উড়ানীর চর ধূলায় ধূসর
যোজন জুড়ি
জলের উপর ভাসুক ধবল
বালুর পুরী।

তোমায় অভিসাপ দেই, এ হারাণো বাঁশী ইহজন্মে আর যেন তুমি খুজে না পাও, তবেই না পল্লী লক্ষ্মীর ছবিখানি আমাদের চোখ ভরে মর্ম্মজুড়ে তোমার সুরে দুলে উঠবে।

জাঙলা ভরিয়া লাউএর লতায়
লক্ষ্মী সে যেন দুলিছে দোলায়
ফাগুণের হাওয়া কলার পাতায়
নাচিছে ঘুরি
উড়ালী চরের বুকের আঁচল
কৃষাণ পুরী।

কবির দয়িত ওপারে "কাল (সে) আসিবে," তার আশা আনন্দ ভয় ব্যাকুলতা ও অবশ আত্মদানের যে চিত্র কবি একেছে তা অনবদ্য।

কাল সে আসিবে মুখখানি তার নতুন চরের মত,
চখা আর চখী নরম ডালায় মুছায়ে দিয়েছে কত।

* * *

মাথায় বাঁধিবে দুধালীর লতা কচি সীমপাতা কাণে,
বেণুর অধর চুমিয়া চুমিয়া মুখর করিবে গানে।
কাল সে আসিবে রাই সরিসার হলদী কোটার শাড়ী,
মটর বোনেরে সাথে করে যেন খুলে দেখে নাড়ি নাড়ি।

* * *

হয় তো দেখিবে হয় দেখিবে না, কাল সে আসিবে চরে,
এপারে আমার ভাঙা ঘরখানি, আমি থাকি সেই ঘরে।

কবির এ চিন্তামণির নাচ দুয়ার হইতে কত রত্ন আর জুড়াইয়া দেখাইব। সারা বালুচরখানি তার দেশলক্ষ্মীর রাঙা পা দুখানি ছোঁয়ায় মণিমন্ত্র হইয়া গিয়াছে।

আকাশের তলে ঘর
যারা বাঁধিয়াছে তাদের তৃষ্ণা অমনি বিপুলতর।"

*　　*　　*

আজও বসে আছি এই বালুচরে, দু'হাত বাড়ায়ে ডাকি—
কাল সে আসিল এই বালুচরে, আর সে আসিবে নাকি?

হায় রে রূপের অতৃপ্ত তৃষ্ণা, প্রেমের অক্ষয় সাধ, ছন্দের আজন্ম আকুতি। ঐ পিপাসা মিটিলে কবি যে ফুরাইয়া যায়। কবির "প্রতিদান"ত তাই কত না অপূর্ব্ব অনবদ্য অনুপম ও প্রতি দানের ও তুলনা কেবল বুঝি বাঙলার স্নিগ্ধ দুধালী লতার রূপেই মিলে।

"আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।"

"কবির সমাধি" কবিতাটির বেদনায় গভীর অতল প্রেমের আর জোড়া নাই, একটু তাহার উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না।

"এ মালায় মোর কি হইবে কাজ"? মালিনীর মেয়ে কয়,
কবি কহে, "সখী, বেদনার দান জগতে যে অক্ষয়!
তুমি কি জান না তোমার বিধাতা তোমারে পাঠাল ভবে।
এই কথা বলে—ও দেহের রূপে জগৎ জিনিতে হবে।
তোমার গলায় মোর মালাখানি এযে তব জয় হার,
ওরূপে তোমার কত মোহ আছে, ভাষা যে এ সখী তার।
মোর মালাখানি লয়ে যাও সখি! মহাকাল নদীজলে—
রূপের তরনী করে টলমল ঘটনার হিল্লোলে।
ওই তব হাসি ওই রাঙা মুখ, ও যেন স্রোতের পানা,
আজ যারে দেখি, কালিকে তাহারে অমনি দেখিতে মানা।"

বিজলী
